সাপ্তাহিক
বিচিত্রা
১০ বর্ষ ৩ সংখ্যা ৫ জুন ৮১/২২ জ্যৈষ্ঠ ৮৮

প্রেসিডেন্ট জিয়া
(১৯৩৬ - ১৯৮১)

...Manager The Bichitra, 1 D I T
Dacca, Bangladesh

...ক বাংলা মুদ্রণালয়,
...ই, টি এভিনিউ, ঢাকা-২
...পাদক কর্তৃক
...ও প্রকাশিত।

টাকাই

সাপ্তাহিক
বিচিত্রা

The Weekly
Bichitra

সম্পাদক
শামসুর রাহমান

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
শাহাদাত চৌধুরী

সহকারী সম্পাদক
মাহফুজউল্লাহ, শাহরিয়ার কবির
শাহযাদ ফারিদ,

বিভাগীয় সম্পাদক
আলমগীর রহমান

সহ-সম্পাদক
চন্দন সরকার

প্রতিবেদক
চিন্ময় মুৎসুদ্দী, কাজী জাওয়াদ,
মাহমুদ শফিক

বিভাগীয় প্রতিবেদক
আনু মুহাম্মদ, শামীমা আজাদ,
আবু যাসুম

শিল্প নির্দেশক
সৈয়দ লুতফুল হক

সহকারী
আহমেদ আলী, অলকেশ ঘোষ

আলোক চিত্রী
শামসুল ইসলাম আলমাজী

কার্টুন : রনবী

কর্মাধ্যক্ষ : আবদুল মালেক

সকল যোগাযোগের ঠিকানা :
বিচিত্রা, দৈনিক বাংলা ভবন,
১ ডি, আই, টি এভিনিউ, ঢাকা-২

মূল্য : তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা

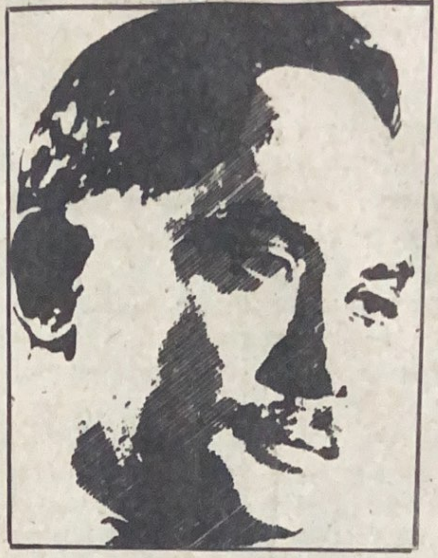

প্রেসিডেন্ট জিয়ার
মৃত্যুতে আমরা
গভীরভাবে শোকাহত

Abdul Awal — 11AM to 4PM.
Hitaishi High School
Phone 3522
983

পাঠকের পাতা

চুনাপাথর কমপ্লেক্স

গ্রীষ্মের ছুটি। অখণ্ড অবসর। আর এ অবসরে ঘুরে বেড়ানোর অদম্য ইচ্ছেটাকে কোনভাবেই দাবিয়ে রাখতে পারিনি। এলাম জয়পুরহাট চুনাপাথর প্রকল্পের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড দেখতে। ঘুরে-ফিরে—ইটের পাহাড় আর দু'চারটে বিক্ষিপ্ত দালান ছাড়া আর তেমন কিছুই চোখে পড়লো না। অবশ্য কয়েকটি নতুন দালান ক্রমশঃ ওপরের দিকে বেড়ে উঠছে--তবে সেটার গতিও খুব ধীর এবং মন্থর।

এতবড় উন্নয়ন প্রকল্পে বিদ্যুৎ যে এভাবে রসিকতা করতে পারে—সেটাও একটা অভিজ্ঞতা! এই আছে তো এই নেই। মজার ব্যাপার হলো—যখন বাতি জ্বলে, তখন সেটা আদৌ জ্বলছে কিনা, তা দেখার জন্যে মাঝে-মধ্যে কুপি বা হ্যারিকেনের সাহায্য নিতে হয়।

এখানকার কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা ব'লে জানতে পারলাম, এরূপ মন্থর গতিতে কাজ এগোতে থাকলে আগামী পাঁচ বছরেও চুনাপাথর উত্তোলন সম্ভব হবে না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে-- চুনাপাথর উন্নয়ন প্রকল্পে কেন এই গড়িমসি ?

রুহুল আমিন বকুল
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকায় সুখন মিয়া

২২ তারিখের বিচিত্রায় 'সুখন মিয়ার ঢাকা দর্শন' বিচিত্রার অন্যান্য বিভাগগুলোর মতোই মজাদার হয়েছে। এবং আরো খুশি লাগছে এই কারণে যে, রনবী সাহেব সুখন মিয়াকে আগামীতেও ঢাকা শহরে রেখে দিচ্ছেন। অনেক দিন পর বিচিত্রায় এমন একটা সিরিজ চালু হলে সত্যি অনেকের কাছেই তা উপভোগ্য হবে নিঃসন্দেহে। তাই রনবী সাহেবকে অনুরোধ করছি—বর্তমান ঢাকার যে অবস্থা তাতে সুখন মিয়াকে দীর্ঘকাল ধরে ঢাকাতে না রাখলে কিছুই দেখা হবে না তার পক্ষে। কাজেই তিনি যেন সুখন মিয়াকে অনেক দিনের জন্যে ঢাকা শহরে থাকার সুব্যবস্থা করে দেন। এতে সুখন মিয়াও অনেক কিছু দেখতে পারবে তার অনুসন্ধিৎসু চোখ জোড়া দিয়ে, আর আমরাও তার অভিজ্ঞতা থেকে অনেক অজানা ব্যাপার স্যাপার সম্পর্কে অবগত হবো।

রুমী কবির
ঢাকা

নোবেল লরেট ও কিছু প্রশ্ন

বর্ষ শুরু সংখ্যা বিচিত্রা'য় প্রকাশিত হায়াত হোসেনের

কে কোন দৃষ্টিতে দেখবো বুঝতে পারছি না। প্রবন্ধটা ভাবিয়ে তোলার মতো। নোবেল বিজয়ী প্রফেসর সালাম ও মাদার তেরেসাকে সামগ্রিককালে যখন দেশে দেশে অভিনন্দিত করা হচ্ছে সে সময় এই প্রবন্ধটি তাঁদের সম্পর্কে আমাদের চিন্তান্বিত করে তুলেছে। সত্যিই যদি তাঁরা সমাজ সেবার 'মুখোশ' পরে ধনবাদী বিশ্বের হিতার্থে কাজ করে থাকেন তাহলে তাঁদের যে যথেষ্ট হেয় হতে হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে প্রবন্ধকারের দুটো বক্তব্যে তাঁর প্রবন্ধে যথেষ্ট জোর এসেছে এ কথা বলা যায়। বক্তব্য দুটো ছিল 'ডঃ নিভাগো' উপন্যাসের নোবেল পুরস্কার পাওয়ার উপযুক্ততা এবং বিখ্যাত দার্শনিক জাঁ পল সার্ত্রের নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যান সম্পর্কে। এই বক্তব্য দুটো নোবেল পুরস্কারের সত্যিকারের মহত্ত্ব বা নিরপেক্ষতার প্রশ্নে সন্দিহান করে তোলে। এ ছাড়া প্রবন্ধটি পড়ে এই উপমহাদেশের দুই বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব নোবেল বিজয়ী প্রফেসর সালাম ও মাদার তেরেসা সম্বন্ধে আমাদের ধারণার যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে!

হাফিম
রেসিডেন্সিয়েল মডেল কলেজ,
কুমিল্লা

কে-ডি-সি বনাম পি-ডি-বি

গত ৪ এপ্রিল আরিচা ঘাটে বর্তমানে নির্মিতব্য ইস্ট ওয়েস্ট ইন্টার কানেক্টরের কাজ স্বচক্ষে দেখে যে আনন্দ ও গর্ব অনুভব করেছি তা মুহূর্তে বিলীন হয়ে গেল যখনই বিচিত্রা ৯ বর্ষ ৪৬ সংখ্যাতে দেখলাম প্রকল্পের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। একদিকে কে-ডি-সির টাকা যথা সময়ে না পেয়ে নির্মাণ সামগ্রী কেনার জন্যে পি-ডি-বির নিকট আড়াই কোটি টাকা ধার দাবি, অন্যদিকে চুক্তিতে নেই বলে পি-ডি-বি টাকা দিতে নারাজ। ফলে টাকার অভাবে যা হওয়ার তাই হতে চলেছে। আশা করি: এমন অবস্থায় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বিষয়টির অবশ্যই একটা সুরাহা করবেন।

মোঃ আঃ হাকিম হাওলাদার
খয়েরতলা, যশোর

সত্যিই বিচিত্র

বাংলাদেশের ফুটবলের মান কেমন? প্রশ্নটি ছোট হলেও উত্তর দেয়া কিন্তু বেশ কঠিন। কারণ আমরা আমাদের বঙ্গ শার্দুলদের দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে লজ্জাজনকভাবে (০—৯ গোলে) পরাজিত হয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করতে দেখেছি আবার ড্র করতেও দেখেছি ঐ দেশটির সঙ্গে।

আবাহনীকে দেখেছি শক্তিশালী ইরানী দলকে পর্যুদস্ত করতে, আফগানিস্তানের সুঠামদেহী খেলোয়াড়দের প্রায় আধা ডজন (৫) গোল উপহার দিতে।

কুয়েত সফরকারী জাতীয় দলকে শূন্য (০) (আস্তে পড়ুন, কেউ শুনে ফেলবে;) পয়েন্ট নিয়ে দেশে ফিরতে দেখে আমরাই মন্তব্য করেছি, 'এবারে জাতীয় দলকে কুয়েত না পাঠিয়ে কক্সবাজারে পাঠালেই ভাল হতো।

যুব দলকে বিগত যুব ফুটবলে রানার্স আপ হতে দেখে যখন 'ক্রীড়া জগতের শীর্ষে আমরা......' গানটির সার্থকতা খুঁজে পেতে যাচ্ছিলাম ঠিক তখনই ঐ যুবদল পাঁচ জনের মধ্যে সগৌরবে পঞ্চম স্থান অধিকার করে প্রমাণ করলো, আমরা আসলে শীর্ষে নই বরং......।

প্রেসিডেন্ট কাপে ইরাকের বাগদাদ ক্লাবের মত তুখোর দলকেও পরাজিত হতে হয়েছে: আবার সেই বীরেরাই শোচনীয় পরাজয় (৫—২ গোলে) মেনে নিয়েছেন দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে।

আর কতদিন আমাদের ফুটবলের মান জোয়ারের পানির মত ওঠানামা করবে ?

—মোঃ নূর হাসান (মানিক)
গাবতলী, বগুড়া

জেনে-শুনে বিষ

সিগারেট পান করলে যে

দুরারোগ্য ক্যান্সারসহ বিভিন্ন ব্যাধি হতে পারে এবং আয়ু কমে যেতে পারে—এ কথা আজ ডাক্তারী মতে পরীক্ষিত বিদেশে এই বদঅভ্যাস মুক্ত করার জন্যে রয়েছে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক সংগঠন—সরকারী পুরস্কার ব্যবস্থা এমন কি সিগারেট প্যাকেটেও সতর্কবাণী কিন্তু আমাদের দেশে তেমন কোন ব্যবস্থা নেই।

সিগারেট কোম্পানীগুলি যদি তাদের উৎপাদিত প্যাকেটে এর ক্ষতিকারক সতর্কবাণী লিখে বাজারজাত করেন—তবে সান্ত্বনা থাকবে 'নেশা-গ্রস্তরা জেনেশুনেই বিষপান করছেন। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এই সম্বন্ধে কি ভাবছেন?

মেসবাহ আহমেদ নাসিম
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ফুলের জন্যে

'ফুল যে ভালবাসে না লোকে বলে সে নাকি মানুষ খুন করতে পারে। কিন্তু এ যে ফুল ভালবাসতে গিয়ে খুন! গোলাপ ফুলের জন্য একটি ন'বছরের শিশুকে প্রাণ দিতে হলো বড় করুণভাবে। স্থানীয় কাউনিয়া প্রধান সড়কের এক বাসার ন'বছরের শিশু লাকসুকে একটি নির্বুদ্ধিতার শিকারে পরিণত হয়ে মরতে হলো বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে।

লাকসুর বন্ধুর বাসার সম্মুখে প্রচুর গোলাপ ফুল ফোটে। গোলাপের বাগান থেকে ফুল চুরি হওয়ার কারণে ঘরের মধ্য থেকে ফুল গাছে বৈদ্যুতিক সংযোগ করে রাখা হয়। প্রতিদিনের মত প্রাতঃ ভ্রমণে বেরিয়ে লাকসু পাশের বাসায় তার বালবন্ধুকে ডাকতে গিয়ে গোলাপ ফুল গাছে দেয়া বৈদ্যুতিক সংযোগে জড়িয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নেয়ার পর তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। লাকসু [illegible] দিন তার বন্ধুর জন্য একটা ফুল ছিঁড়তে গিয়ে তারে জড়িয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। ফুলের গাছে বৈদ্যুতিক সংযোগ দিয়ে রাখার মত কাজ যারা করে তারা কি ফুল ভালবাসে?

ৱসিম মল্লিক
বরিশাল

ইচ্ছে হয়

হাসতে ভালো লাগে ফুলের মতো মুক্ত হাসি। ভীষণ ভালো লাগে প্রজাপতির মতো উড়ে উড়ে ঘুরে বেড়াতে। কিন্তু কেন পারি না? কেন এত সামাজিক বাধা বিপত্তি?

কেন আমরা একটু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এত জটিল হয়ে যাই?

এত কৃত্রিম হয়ে যাই?

বিকেলে যখন বারান্দায় বসে ছোট ছোট মেয়েদের খেলা দেখি তখন ভীষণ ইচ্ছে হয় ওদের মতো আমিও যদি আবার সেই ছোট্ট সোনামনি হয়ে যেতে পারতাম!

নাইমা,
সিলেট

অভিনয়

আমরা পরস্পরের সতীর্থ ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম। ছোট্ট একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভুল বোঝাবুঝি। এরপর ভদ্র মহিলা আমাকে অপমান করে চিঠি লিখলেন। আহত বাঘের মত রাগের মাথায় জবাব দিলাম ৩ গুণ অপমান মেখে। স্বাভাবিকভাবেই কথা বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু একটা অপরিহার্য কারণে ছাত্র জীবনের বাকি দু'টি বছর উভয়কেই অন্যান্য বন্ধুদেরসহ একত্রে মেলামেশা বা বন্ধুত্বের অভিনয় করতে হয়েছে। মুখোমুখি হলেই বারবার মনে হয়েছে, আমাকে চোখের বালি মনে করে, এমন একজনের সামনে দাঁড়ালাম। তবে কথা বন্ধ রেখেও উভয়ের অভিনয় এতই চমৎকার ছিল যে, অন্যান্য বন্ধুরা এ তিক্ত সম্পর্কের কথা টেরই পায়নি।

ছাত্র জীবন প্রায় শেষ। দু'দিন পরেই আমরা পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবো। দেখা হবে না আর কোন দিন। পেছনে পড়ে থাকবে টুকরো টুকরো কিছু স্মৃতি। শুধুই স্মৃতি।

নজরুল ইসলাম
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

কোনটি সঠিক ?

গত ১৩ মে ভ্যাটিকানে পোপ ২য় জন পল আততায়ীর গুলিতে আহত হয়েছেন। কিন্তু আততায়ীর নাম পত্র-পত্রিকায় রেডিও-টেলিভিশনে প্রকাশিত হয়েছে নানাভাবে। যেমনঃ মহম্মদ আলী আকচা, মহম্মদ আলী আকছা, মেহমত আলী আগাকা মেহমত আলী আগকা আলী আফজাল ইত্যাদি। এখন প্রশ্ন কোনটি সঠিক ?

গোলাম সারোয়ার স্বপন
গাইবান্ধা, রংপুর

[সঠিক বানান হবে 'মেহমেত আলী আগচা।'—বি, স]

প্রত্যাশিত দুর্ঘটনা (?)

আমরা দু'বোন গিয়েছিলাম বায়তুল মোকাররমে শপিং-এ। পড়ন্ত বিকেল বেলা। কেনা-কাটা শেষ। ফিরে আসছি বাসায়। জি, পি, ওর পাশ দিয়ে রিকশাটা মোড় নিলো মুক্তাঙ্গনের কাছাকাছি। পাশিপাশি আসছিলো হোন্ডা-আরোহী এক তরুণ। রিকশাটার একটু আগে আগে চলছিলো সে, আর ঘুর ঘুরে পেছন ফিরে আমাদের দেখছিলো। আমি বোনকে বললামঃ লোকটা এভাবে চলতে থাকলে হয়তো অ্যাকসিডেন্ট করে বসবে। লোকটা তখনো তেমনি এগোচ্ছিল কিন্তু দৃষ্টি পেছনের রিকশার দিকে। একটু এগোতে ধাক্কা খেলো সামনের একটা রিকশার সঙ্গে। ফলে পেছনের রিকশাগুলো হুড় মুড় করে ধাক্কা খেতে লাগলো একটার সঙ্গে আরেকটা। ভিড় জমে গেল মুহূর্তে। ততক্ষণে আমাদের রিকশা এগিয়ে গেছে অনেক দূর। এর পরের ঘটনা জানি না। এই যে দুর্ঘটনা প্রত্যাশিত দুর্ঘটনা কিন্তু দায়ী কে?

মাহমুদা সুরাইয়া নাসরীন
ঢাকা-৯

চলচ্চিত্র উৎসবের প্রতীক

ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব নিয়ে অনেকে অনেক কথা বললেন, লিখলেন। কিন্তু উৎসবের মনোগ্রামটি নিয়ে কাউকে কোন কথা বলতে শুনলাম না। আন্দাজ করি উৎসবের প্রতীকটি কোন বিখ্যাত, কৃতী শিল্পীরই করা। বুঝলাম সাদা আর কালো দু'টুকরো সেলুলয়েডের মাধ্যমে তিনি ফটো পজেটিভ আর সাউন্ড পজিটিভকে ধরতে চেয়েছেন। খুব ভালো কথা। কিন্তু দুটো টুকরোর মাথা একটু তেরচা কাটবার পর গোটা মনোগ্রামটা কিসের মটিফ হয়ে দাঁড়িয়েছে? একটি বেতের ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটের? যদি তাই হতো তবু কিছুটা ভাল হতো, বাংলাদেশের হস্তশিল্পের একটা নমুনা খুঁজে পাওয়া যেত। বিভিন্ন দেশে চলচ্চিত্র উৎসবের মনোগ্রাম আর ট্রফির মধ্যে যেমন সেই দেশের ঐতিহ্যকে খুঁজে পাওয়া যায় তেমনি হতো। কিন্তু দুঃখজনক হলো, অনেকে বলছেন মনোগ্রামটি আসলে বাজে কাগজের ঝুড়ির মটিফ নয়, ওটিতে রাজমুকুটের এফেক্ট আনার চেষ্টা করা হয়েছে। বুঝলাম না দু'শ বছর বৃটিশ রাজমুকুটের পদানত থেকে আবার আমাদের কি আহ্লাদ হলো যে, স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের মনোগ্রামে সাম্রাজ্যবাদী গণবিরোধী ক্ষমতার উৎস, রাজমুকুটের মটিফ আঁকতে হবে?

স্বপ্না মৌসুমীন
বগুড়া

জিয়া নিহত

৩০ মে শনিবার ভোরে চট্টগ্রামে কিছু সংখ্যক দুষ্কৃতকারীর হাতে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বীর উত্তম নিহত হন (ইন্নালিল্লাহে......রাজেউন)। ঘটনা সম্পর্কে প্রেস নোটে বলা হয় :—

'সরকার গভীর দুঃখের সংগে ঘোষণা করছেন যে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বীর উত্তম ৩০ মে শনিবার ভোরে চট্টগ্রামে কিছুসংখ্যক দুষ্কৃতকারীর হাতে নিহত হয়েছেন (ইন্নালিল্লাহে......রাজেউন)। প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা রক্ষী ও অপর কয়েকজনও এই মর্মান্তিক ঘটনায় নিহত হয়েছেন। ঢাকা এবং চট্টগ্রামের মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় নিহত ব্যক্তিদের প্রকৃত সংখ্যা সঠিক জানা যায়নি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(১) ধারার বিধানবলে ভাইস-প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করছেন।

মন্ত্রিসভার এক জরুরী বৈঠক সংগে সংগেই অনুষ্ঠিত হয় এবং পরিস্থিতি পর্যালোচনার পর অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সারা দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছেন। অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট ও তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যবর্গ সারাদিন ধরে পরিস্থিতি প্রতিনিয়ত পর্যালোচনা করছেন। সশস্ত্র বাহিনী, বিডিআর ও পুলিশের প্রধানরা পুনরায় দৃঢ়তার সংগে দেশের নিয়মতান্ত্রিক সরকারের প্রতি তাঁদের সর্বাত্মক আনুগত্য ঘোষণা করেছেন।

চট্টগ্রামে যে দুষ্কৃতকারীরা নিজেদের বিপ্লবী পরিষদ বলে

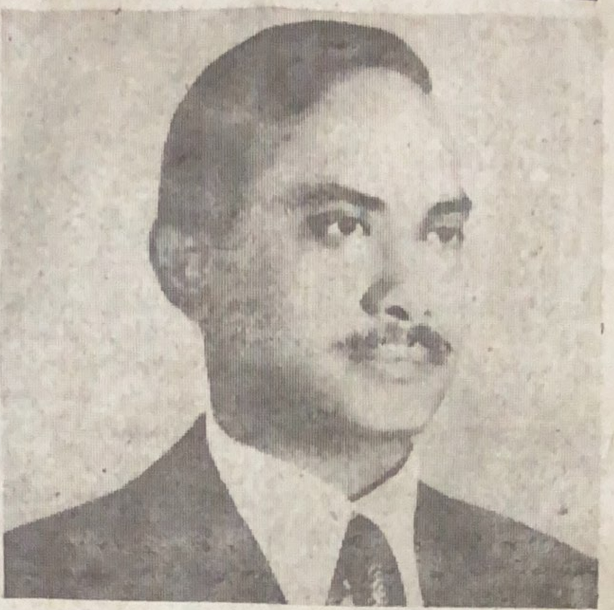

অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তার

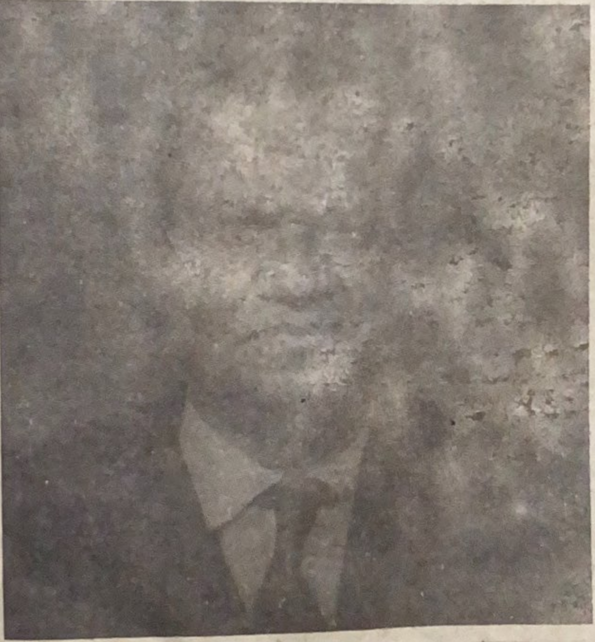

পরিচয় দিচ্ছে, অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট এবং সেনাবাহিনীর স্টাফ প্রধান অবিলম্বে সরকারের কাছে তাদের আত্মসমর্পন করার নির্দেশ দিয়েছেন।

সন্ধ্যায় অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট

সব জাতীয় রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেন।

উপস্থিত নেতৃবৃন্দ সকালে চট্টগ্রামে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করেন। এই বেদনাদায়ক ঘটনার নিন্দা জানিয়ে তাঁরা পুনরায় দৃঢ়তার সংগে নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক রাজনীতির প্রতি তাঁদের দৃঢ় আনুগত্য ব্যক্ত করেন এবং হিংসার রাজনীতির নিন্দা করেন। নেতৃবৃন্দ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মৃত্যুতে গভীর দুঃখ ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করেন এবং মরহুমের রূহের মাগফেরাত কামনা করেন।

৪০ দিনব্যাপী শোক

অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণের পর বিচারপতি জনাব আবদুস সাত্তার জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া এক ভাষণে ঘোষণা করেন প্রেসিডেন্ট জিয়ার মৃত্যুতে জাতি ৪০ দিনব্যাপী শোক পালন করবে এবং ঐ সময়ে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকবে।

অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের ভাষণ

অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তার ৩০ মে এক বেতার ভাষণে বলেন,

'আমি গভীর বেদনা ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আপনাদেরকে জানাচ্ছি যে আমাদের প্রিয়নেতা ও মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব জিয়াউর রহমান আজ সকালে চট্টগ্রামে দুষ্কৃতকারীদের হাতে শাহাদৎ বরণ করেছেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না এলাইহে রাজেউন)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(১) ধারা মোতাবেক আমি রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেছি।

আমি বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের কাছে আবেদন করছি যে এই জাতীয় দুর্যোগের মুহূর্তে আপনারা ধৈর্য ও সংহতি সহকারে এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে শান্তি শৃংখলা বজায় রাখবেন এবং জনজীবন স্বাভাবিকভাবে পরিচালনায় সহায়তা করবেন। মন্ত্রিসভার সকল সদস্য তাঁদের কর্তব্য যথারীতি পালন করে যাচ্ছেন।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে সকল বৈদেশিক সরকারের আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক চুক্তি বলবৎ থাকবে।

পরিস্থিতির বিস্তারিত বিবরণ আপনাদেরকে সরকারের তরফ থেকে শীঘ্রই অবহিত করা হবে। বাংলাদেশ সরকার আজ থেকে চল্লিশ দিন যাবৎ জাতীয় শোক পালনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছে। এই সময়ে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকবে।'

জরুরী অবস্থা ঘোষণা

একই তারিখে (৩০ মে) অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তার এক ঘোষণায় সারাদেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন।

দেশের সংবিধানের ১৪১ক (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট মনে করেন যে দেশে এক গুরুতর জরুরী অবস্থা বিরাজ করছে এবং অভ্যন্তরীণ বিশৃংখলার জন্যে

পিতার কফিনের পাশে কান্না বিজড়িত ছোট ছেলে কেকো

বাংলাদেশের নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন।

জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর সরকার এক আদেশ বলে সংবিধানে বর্ণিত কয়েকটি মৌলিক অধিকার স্থগিত বলে ঘোষণা করেন।

সরকারী আদেশে বলা হয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪১গ অনুচ্ছেদের এক নম্বর ধারায় বর্ণিত প্রদত্ত ক্ষমতা অনুযায়ী অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট এই মর্মে ঘোষণা করেন যে সংবিধানের ২৭, ৩১ ৩২; ৩৩; ৩৫; ৩৬; ৩৭; ৩৮, ৩৯; ৪০; ৪২ ও ৪৩ অনুচ্ছেদের প্রয়োগের জন্যে যে কোন ব্যক্তির আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার অধিকার এবং এই সকল অধিকার প্রয়োগ সংক্রান্ত সকল মামলা জরুরী অবস্থা চলাকালে স্থগিত থাকবে।

স্থগিত ঘোষিত মৌলিক অধিকার গুলো হচ্ছে ঃ আইনের দৃষ্টিতে সমানাধিকার, আইনের আশ্রয়লাভের অধিকার ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং গ্রেফতার ও আটকের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা।

স্থগিত ঘোষিত অন্যান্য মৌলিক অধিকারগুলো হচ্ছেঃ বিচার ও সাজার ব্যাপারে নিরাপত্তা, চলাফেরার স্বাধীনতা সমাবেশের ও সভা সমিতির অধিকার চিন্তা, বিবেক দৃষ্টি ও বাক-স্বাধীনতা বৃত্তি গ্রহণের স্বাধীনতা, সম্পত্তির অধিকার গৃহ ও যোগাযোগের নিরাপত্তার অধিকার।

জরুরী অবস্থা ঘোষণার ব্যাখ্যা

অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি জনাব আবদুস সাত্তার বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪১ক অনুচ্ছেদের এক দফা অনুযায়ী যে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছেন তাতে কোন সামরিক আইন বা বিধি জারি করার কোন প্রশ্নই ওঠে না বলে এক সরকারী মুখপাত্র জানান।

জরুরী অবস্থার ব্যাখ্যাদান প্রসঙ্গে মুখপাত্র বলেন, জরুরী অবস্থা ঘোষণার ফলে জাতীয় সংসদ বা সংবিধান বাতিল করা হয় নাই। জাতীয় সংসদ যথারীতি বলবৎ আছে এবং থাকবে। আগামী সোমবার সংসদের নিয়মিত অধিবেশন বসবে।

সংবিধানের ১৪১খ অনুচ্ছেদ মোতাবেক জরুরী অবস্থা ঘোষণার ফলে সংবিধানের ৩১ ৩৭; ৩৮; ৩৯; ৪০ ও ৪২ অনুচ্ছেদসমূহ কার্যতঃ স্থগিত থাকবে। এর অর্থ এই যে, জরুরী অবস্থা চলাকালে সংসদ কোন আইন বা সরকার কোন নির্বাহী ব্যবস্থা যদি গ্রহণ করেন এবং তা যদি উক্ত অনুচ্ছেদসমূহের খেলাপও হয় তবে, এ খেলাপজনিত কারণে ঐ আইন বা নির্বাহী ব্যবস্থা বেআইনী বা অকার্যকর হবে না। তবে জরুরী অবস্থা রহিত করার সঙ্গে সঙ্গে ঐ খেলাপ আইন বা নির্বাহী ব্যবস্থা বাতিল বলে গণ্য হবে।

জরুরী আইনের আওতায় সভা সমিতি, গণজমায়েত ও মিছিল নিষিদ্ধ।

আইন-শৃংখলা বজায় রেখে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখার জন্য উপরোক্ত ব্যবস্থাসমূহ সাময়িকভাবে প্রবর্তন করা হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বীর উত্তম এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ১৯৩৬ সালে বগুড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৩ সালে তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন এবং ১৯৫৫ সালে কমিশন পান।

১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় জেনারেল জিয়াউর রহমান ছিলেন ফার্স্ট ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি কোম্পানী কম্যান্ডার এবং লাহোরের খেমকারান সেন্টারে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেন। ১৯৬৬ সালে তিনি কাকুলস্থ পাকিস্তান সামরিক একাডেমীতে ইন্সট্রাক্টর নিযুক্ত হন। ১৯৬৬ সালে তিনি কোয়েটা স্টাফ কলেজে যোগ দেন।

১৯৭০ সালের অক্টোবর মাসে তাকে নবগঠিত অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের দায়িত্ব দিয়ে চট্টগ্রামে পাঠানো হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনী ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ নিরস্ত্র জনগণের উপর সামরিক অভিযান শুরু করলে তিনি গণ-অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দেন।

তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে তিনি ঐ ঐতিহাসিক ঘোষণা দেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে জেনারেল জিয়াউর রহমান কুমিল্লায় একটি ব্রিগেডের কমান্ডার হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৭২ সালের জুনে তাকে সেনাবাহিনীর ডেপুটি চীফ অব স্টাফ নিযুক্ত করা হয়। ১৯৭৫ সালের ২৫ আগস্ট তিনি সেনাবাহিনী প্রধান নিযুক্ত হন।

১৯৭৫ সালের ৭ নবেম্বরের সরকার পরিবর্তনের পর জিয়াকে উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত করা হয়। ১৯৭৬ সালের ২৯ নবেম্বর তিনি প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত হন।

১৯৭৭ সালের ২১ এপ্রিল জেনারেল জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তিনি শতকরা ৭৭ ভাগ ভোট পেয়ে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হন।

১৯৭৮ সালের ১২ জুন অনুষ্ঠিত নির্বাচনে তিনি তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীকে ১ কোটি ১০ লাখ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন এবং প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

১৯৭৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন এবং ঐ দলের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত দেশের সাধারণ নির্বাচনে তার বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) জাতীয় সংসদের ৩শ আসনের মধ্যে ২২০টি আসন লাভ করে। সাধারণ নির্বাচনের পর প্রেসিডেন্ট জিয়া দেশ থেকে সামরিক আইন ও জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার করে পূর্ণ গণতন্ত্র চালু করেন।

প্রেসিডেন্ট জিয়া লন্ডন ও লুসাকায় অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ রাষ্ট্রপ্রধানদের সম্মেলন, সিডনীতে কমনওয়েলথ রাষ্ট্র প্রধানদের আঞ্চলিক সম্মেলন, কলম্বোয় অনুষ্ঠিত জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে যোগ দেন এবং সৌদী আরব, মিসর, সংযুক্ত আরব আমীরাত, ইরাক, ইরান, পাকিস্তান, ভারত, শ্রীলংকা, নেপাল, জাপান, বার্মা থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর, নেদারল্যান্ড, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র বেলজিয়াম, মালী, সেনেগাল, গিনি এবং

জরুরী বৈঠক

৩০ মে শনিবার পৃথক পৃথক ভাবে দু দফায় অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট তিন বাহিনী প্রধান এবং সকল রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন বঙ্গভবনে।

বৈঠকে এই মর্মান্তিক ও বেদনাদায়ক ঘটনায় গভীর দুঃখ প্রকাশকালে নেতৃবৃন্দ নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক রাজনীতির প্রতি তাদের অবিচল আস্থা পুনর্ব্যক্ত করেন এবং হিংসাত্মক রাজনীতির নিন্দা করেন।

নেতৃবৃন্দ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের অকাল মৃত্যুতে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করেন এবং তাঁর রুহের মাগফেরাতের জন্য সর্বশক্তিমান আল্লার নিকট মোনাজাত করেন।

বৈঠকে উপস্থিত নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন জাতীয় লীগের আতাউর রহমান খান, ডেমোক্র্যাটিক লীগের খন্দকার মোশতাক আহমদ ও শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, আওয়ামী লীগের (মিজান) মিজানুর রহমান চৌধুরী এমপি ও নূরে আলম সিদ্দিকী, বাংলাদেশের কম্যুনিস্ট পার্টির মণি সিং জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের মেজর (অবসরপ্রাপ্ত) এম এ জলিল, আ স ম আবদুর রব শাজাহান সিরাজ এমপি, মীর্জা সুলতান রাজা ও রুহুল আমীন ভূঁইয়া, পিপলস লীগের ডঃ আলীম আল-রাজী জাতীয় জনতা পার্টির জেনারেল এম এ জি ওসমানী, সাম্যবাদী দলের মোহাম্মদ তোয়াহা, মুসলিম লীগের (সবুর) সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী এমপি ও এম এ মতিন এমপি, মুসলিম লীগের (সিদ্দিকী) বিচারপতি বি এ সিদ্দিকী, গণতান্ত্রিক পার্টির নুরুল হুদা মীর্জা, সিরাজুল হোসেন খান ও দিলীপ বড়ুয়া, আওয়ামী লীগের (হাসিনা) সালাহউদ্দিন ইউসুফ এমপি, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের রাশেদ খান মেনন এমপি, ওয়ার্কার্স পার্টির হায়দার আকবর খান রনো, ইউনাইটেড পিপলস পার্টির কাজী জাফর আহমদ ও মোস্তফা জামাল হায়দার ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (হারুন) পংকজ ভট্টাচার্য, একতা পার্টির সুরঞ্জিৎ সেনগুপ্ত, সর্দার আবদুল্লা হালিম ও সৈয়দ আলতাফ হোসেন

পশ্চিম জার্মানীতে রাষ্ট্রীয় সফর করেন।

বিচিত্রার ক্যামেরায়

১৯৮০ সালের ২৬ আগস্ট প্রেসিডেন্ট জিয়া জাতিসংঘের বিশেষ অধিবেশনে ভাষণ দেন। ১৯৮১ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি মক্কা শরীফে অনুষ্ঠিত তৃতীয় ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেন। তিনি ইসলামী সম্মেলনের তিন সদস্যবিশিষ্ট আল কুদস কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন।

প্রেসিডেন্ট জিয়া ইরান-ইরাক যুদ্ধাবসানের প্রচেষ্টায় ইসলামী সম্মেলনে গঠিত ৯ সদস্যের শান্তি মিশনে শীর্ষ স্থানীয় ভূমিকা পালন করছিলেন। তিনি ১৯৮১ সালের মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে একাই তেহরান ও বাগদাদ সফর করেন। এরপর তিনি পশ্চিম জার্মানীও সফর করেন।

লেবার পার্টির মওলানা এম এ মতিন, ইসলামিক ডেমোক্র্যাটিক লীগের মওলানা আবদুর রহিম জামাতে ইসলামীর আব্বাস আলী খান, মওলানা ইউসুফ ও শামসুর রহমান বাংলা জাতীয় লীগের মিসেস আমেনা বেগম, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (নাসের) আবদু নাসের খান ভাসানী, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (নুরু) নুরুর রহমান, জাগপার শফিউল আলম প্রধান ডঃ এম ও গনি এমপি (স্বতন্ত্র) এম এ হক এমপি (স্বতন্ত্র) আহমেদুল কবীর এমপি (স্বতন্ত্র) গণতান্ত্রিক কর্মী শিবিরের কমরেড মেহেদী, শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দলের সিদ্দিকুর রহমান ও নির্মল সেন, ন্যাপের (মোজাফফর) এডভোকেট ইসমাইল। এছাড়াও ছিলেন আতাউল হক খান, আসাদুর আলী এডভোকেট, এ জি মনসুর; ফরমানউল্লাহ খান, ময়েরুদ্দিন সিরাজুল হুদা ও এম এ হক।

সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী প্রধানের সঙ্গে বৈঠকে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট পরিস্থিতির সার্বিক পর্যালোচনা করেন। এ বৈঠকে বিডিআর এর মহাপরিচালক ও পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেলও উপস্থিত ছিলেন। তিন সশস্ত্র বাহিনী, বিডিআর ও পুলিশ প্রধানরা দেশের সাংবিধানিকভাবে নির্বাচিত সরকারের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের কথা পুনরায় দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন।

নাগরিক জীবন ও গায়েবানা জানাজা ঃ

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের নিহত হওয়ার সংবাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জাতি এক-দিকে যেমন শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ে তেমনি বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তবে সকলে ধৈর্যের সঙ্গে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে সরকারকে সহযোগিতা করেন।

রাজপথে মিছিলে ৩০ মে তারিখেই শ্লোগান ওঠে ঃ প্রেসিডেন্ট জিয়ার রক্ত বৃথা যেতে দেব না। বাংলাদেশের মহান নেতা—জিয়া তুমি বেঁচে রবে।

এদিনই (৩০ মে) সরকারী-ভাবে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন-স্থানে পরদিন প্রেসিডেন্ট জিয়ার জানাজা হবে বলে ঘোষণা করা হয়। ৩১ মে ঢাকা স্টেডিয়ামে লাখো লাখো

দুর্যোগময় রাত্রির শিকার

শোকার্ত মানুষ সমবেত হন জানাজায় অংশ নিতে। রেডক্রস সোসাইটির মাধ্যমেও লাশ আনতে ব্যর্থ হয়ে গায়েবানা জানাজা করা হয়। নামাজে জানাজায় ইমামতি করেন বায়তুল মোকাররম মসজিদের ইমাম। -

নামাজে জানাজা শুরুর আগে ইমাম সাহেব মাইকে 'সুরা আররাহমান' পাঠ শুরু করলে স্টেডিয়াম জুড়ে সৃষ্টি হয় এক বিয়োগ-বিধুর পরিবেশ। সুরা আররাহমান পাঠ শেষে ইমাম সাহেবের কন্ঠে কন্ঠ মিলিয়ে লাখো মানুষের

মিলাদ পাঠ শুরু হলে উপস্থিত প্রতিটি মানুষের চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠে।

মিলাদ শেষে আবেগজড়িত কন্ঠে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি জনাব আবদুস সাত্তার বিশাল জামাতের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন : মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়া গণতন্ত্র ও এদেশের জনগণের জন্যে জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। তাঁর মৃতদেহ চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় আনার জন্যে রেডক্রসসহ বিভিন্ন উপায়ে প্রচেষ্টা চালিয়ে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। ওরা আমাদের কোন কথারই জবাব দেয়নি—এই ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে কোন কথা বলেনি। তাই আজ আমরা গায়েবানা নামাজে জানাজা আদায় করছি।

তিনি বলেন : জীবিত অবস্থায় আমাদের প্রিয় প্রেসিডেন্ট জিয়া আপনাদের কাছে কোন দোষ ত্রুটি অপরাধ করে থাকলে আজ ক্ষমা করে দেবেন। জীবিত অবস্থায় মানুষের দোষ ত্রুটি করা অস্বাভাবিক কিছু নয়। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির এ কথায় স্টেডিয়াম ভর লাখ লাখ মানুষ ডুকরে কেঁদে উঠেন। সবার চোখের পানি পড়াছিল গড়িয়ে। সঙ্গে সঙ্গে আকাশ ভেঙ্গে নামে প্রবল বৃষ্টিও।

এই অঝোর বৃষ্টির মধ্যেই স্বাধীনতার ঘোষক, পঁচাত্তরের সাতই নবেম্বরের আস্থাভাজন নেতা সামরিক আইন থেকে গণতন্ত্রে উত্তরণের রাষ্ট্রনায়ক আপামর জনসাধারণের প্রিয় প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বীর উত্তম, পিএসসি-এর নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এক বিশেষ মোনাজাতে ক্রন্দনরত লক্ষ লক্ষ মানুষ কামনা করেন মহান নেতার রূহের মাগফেরাত।

নামাজে জানাজায় প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান, স্পীকার মির্জা গোলাম হাফিজ, উপ-প্রধানমন্ত্রী এস এ বারী এটি ও জামালউদ্দিন আহমদ প্রধান বিচারপতি জনাব কামালউদ্দিন হোসেনসহ মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবর্গ সংসদ সদস্যবৃন্দ পদস্থ সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দ এবং ঢাকাস্থ মুসলিম দেশগুলোর রাষ্ট্রদূতগণও অংশগ্রহণ করেন।

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে বিরোধী দলীয় সংসদ নেতা আসাদুজ্জামান খানসহ আতাউর রহমান খান, খান এ সবুর কাজী আবদুল কাদের জেনারেল (অব) এম এ জি ওসমানী আ স ম আবদুর রব, শাহজাহান সিরাজ মওলানা আবদুর রহিম আব্বাস আলী খান মওলানা আবদুল মতিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

নামাজে জানাজা শেষে একটি

পিতার কফিনের পাশে রোরুদ্যমান বড় ছেলে তারেক রহমান

বিমান বন্দরে কফিন এসে পৌঁছলে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন তিন বাহিনীর সদস্যরা

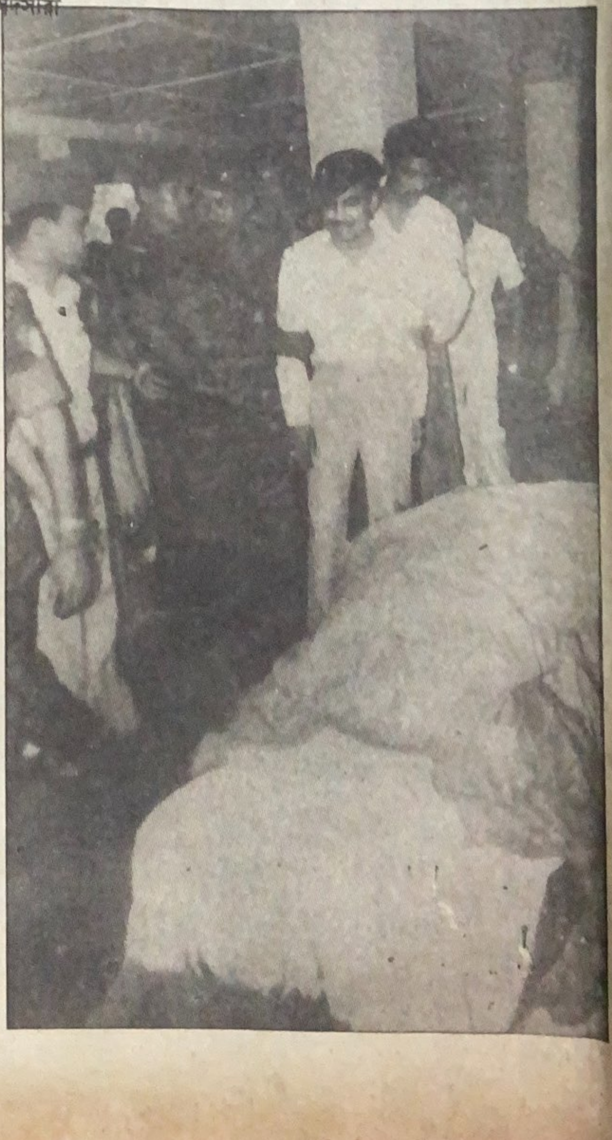

শোক মিছিল রাজধানীর রাজপথ প্রদক্ষিণ ক...। মিছিলে মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়ার বৃহদাকার প্রতিকৃতি ও ছবি বহন করা হয়। মিছিল বায়তুল মোকাররম থেকে তোপখানা রোড, মওলানা ভাসানী এভেন্যু পিজি হাসপাতাল বাংলা মোটর ফার্ম গেট হয়ে জাতীয় সংসদ ভবন সম্মুখে এসে শেষ হয়।

এছাড়াও এদিন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয় বরিশাল দিনাজপুর, রংপুর ময়মনসিংহ কুষ্টিয়া কুমিল্লা ঝিনাইদহ ফরিদপুর ব্রাহ্মণবাড়িয়া সিরাজগঞ্জ গাইবান্ধা ঘোড়াশাল সহ দেশের সর্বত্র।

প্রচার মাধ্যম

দেশের আপৎকালীন সময়ে জনগণকে বিভ্রান্তি, অপপ্রচার ও শংকার হাত থেকে রেহাই দিয়ে থাকে প্রচারমাধ্যমগুলো। তাৎক্ষণিক সংবাদ সরবরাহে রেডিও ও টিভি'র ভূমিকা উল্লেখ্য। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের হত্যার ঘটনার পর রেডিও বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ টেলিভিশনও স্ব স্ব দায়িত্ব পালনে আন্তরিক প্রচেষ্টা নেয়। তুলনামূলকভাবে টিভি'র চেয়ে রেডিও তৎপর ছিল বেশি এবং দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সংগে রেডিওর যোগাযোগই উল্লেখযোগ্য।

টেলিভিশনে ও রেডিওতে সকল সরকারী নির্দেশ ও সংবাদ বুলেটিন প্রচার করা হয় ঘন ঘন। তবে টেলিভিশনে সংবাদ বা ঘোষণা প্রচারের চেয়ে ধর্মীয় সঙ্গীত ও তেলাওয়াতেই সময় ক্ষেপন করা হয় বেশি। ৩১ মে দেখা গেছে রাত ৮টার সংবাদ ১০ মিনিট পরে শুরু হতে এবং ১ জুন দৈনিক সম্পাদকীয় প্রচার গুলোর বরতে অনেক বেলায়। ধর্মীয় সঙ্গীত ও তেলাওয়াতের সংগে আরো বেশী করে প্রামাণ্য চিত্র (প্রেসিডেন্ট জিয়া সম্পর্কিত) দেখানো যেত।

শোকাবিভূত আত্মীয় পরিজন বেষ্টিত সংজ্ঞাহীন বেগম জিয়া। সর্বডানে বেগম বাশার এবং সর্ববামে প্রেসিডেন্ট জিয়ার শাশুড়ী

প্রতিটি জাতীয় দৈনিকই ৩১ মে প্রেসিডেন্ট জিয়ার হত্যা সংবাদ ব্যানার হেডিং ও কালো বর্ডার দিয়ে প্রকাশ করে। এ ঘটনার ওপরই প্রকাশ করে সম্পাদকীয়। সম্পাদকীয়তে জাতীয় ঐক্য, সংহতি ও রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষাকল্পে সাংবিধানিক সরকারের প্রতি সহযোগিতাদানের উল্লেখ করে। সম্পাদকীয়তে ঘটনার তীব্র নিন্দাও জানানো হয়।

বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পণের নির্দেশ

৩১ মে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তার সশস্ত্র বাহিনীর তিন প্রধানের প্রতি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। এর আগে ৩০ মে বিদ্রোহীদের প্রতি আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেন অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট।

অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের নির্দেশে সেনাবাহিনী স্টাফ প্রধান লেঃ জেনারেল এইচ এম এরশাদ ৩১ মে এক চূড়ান্ত নির্দেশ জারী করেন। নির্দেশে তিনি ১ জুন সকাল ৬টার মধ্যে মেজর জেনারেল মঞ্জুরসহ চট্টগ্রামের সকল দুষ্কৃতকারী ও তাদের কমান্ডিং অফিসারদের আত্মসমর্পণ করতে বলেন। এ নির্দেশে ৩১ মে দুপুরের মধ্যে আত্মসমর্পণের মূল সময়সীমা আরো ১৮ ঘন্টা বাড়িয়ে দেয়া হয়।

জেনারেল এরশাদ চূড়ান্ত অনুগত বিপুল সংখ্যক অফিসার ও সেনা আত্মসমর্পণ করতে শুরু করেছে বলে এই সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে।

তিনি বলেন, বিপুল সংখ্যক অনুগত অফিসার ও সৈন্য তাঁর আহবানে সাড়া দিতে শুরু করেছে।

জেনারেল এরশাদ চূড়ান্ত সময় সীমার মধ্যে আত্মসমর্পণ করে সাধারণ ক্ষমার সুযোগ গ্রহণের জন্য চট্টগ্রামের বিপথগামী অফিসার ও সৈন্যদের প্রতি আহবান জানান। যারা তাঁর নির্দেশ মানবে তিনি তাদের পূর্ণ

যাদের গ্রেফতার করা হয়

চট্টগ্রামের ঘটনায় সেনাবাহিনীর নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের গ্রেফতার করা হয়। মেজর জেনারেল আবুল মঞ্জুর (নিহত) ব্রিগেডিয়ার মহসিনউদ্দীন আহমেদ কর্নেল নওয়াজিসউদ্দীন, কর্নেল আবদুর রশীদ লেঃ কর্নেল দেলওয়ার হোসেন লেঃ কর্নেল ফজলে হোসেন (আহত) লেঃ কর্নেল মতিউর রহমান (নিহত), লেঃ কর্নেল মাহবুবুর রহমান মেজর রেজা মেজর লতিফুল আলম চৌধুরী মেজর ফজলুল হক মেজর মুজিবুর রহমান মেজর রওসন ইয়াজদানী, মেজর দোস্ত মোহাম্মদ শিকদার; ক্যাপ্টেন গিয়াস ক্যাপ্টেন মুনির ক্যাপ্টেন জামিল (আহত), ক্যাপ্টেন ইলিয়াস লেঃ মতি ও লেঃ মোসলেহ।

মেজর জেনারেল এম এ মঞ্জুর

নিরাপত্তার আশ্বাস দেন।

এ ছাড়াও মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্যে ১ জুন সরকারী ছুটি ঘোষণা করা হয়।

জাতীয় নেতৃবৃন্দের শোক

দলমত নির্বিশেষে দেশের সকল মহল থেকে প্রেসিডেন্ট জিয়ার হত্যাকান্ডের তীব্র নিন্দা ঘৃণা ও শোক প্রকাশ অব্যাহত রয়েছে। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত শোকবাণীগুলো হচ্ছেঃ

অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তার ৩০ মে, মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের বাসভবনে যান এবং বেগম জিয়াউর রহমান ও শোকাভিভূত পরিবারের অন্যান্য সদস্যের প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত শোক প্রকাশ করেন।

স্পীকার মীর্জা গোলাম হাফিজ এক শোকবাণীতে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের দুঃখজনক ও কাপুরুষোচিত গুপ্ত হত্যায় শোক প্রকাশ করেন। স্পীকার বলেন, তাঁর মৃত্যুতে জাতি সাধারণ মানুষের কল্যাণে নিবেদিত একজন মহান দেশপ্রেমিক ও জাতীয়তাবাদীকে হারালো। মরহুম প্রেসিডেন্টের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে মীর্জা হাফিজ বলেন, আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং জাতীয় উন্নয়নে তাঁর অবদান বিপুল। স্পীকার মীর্জা গোলাম হাফিজ বলেন, প্রেসিডেন্ট জিয়া জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের মহান প্রবক্তা ছিলেন এবং বাংলাদেশের সঙ্গে অন্যান্য জাতি বিশেষত ইসলামী বিশ্বের বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্ক জোরদার করার ক্ষেত্রে মহান ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

তিনি বলেন, নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেন্ট পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশের জনসাধারণ তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। ইতিহাসে তিনি বাংলাদেশের একজন মহান সন্তান বলে গণ্য হবেন। স্পীকার মরহুম প্রেসিডেন্টের শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন।

জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পীকার ব্যারিস্টার সুলতান আহমদ চৌধুরী প্রেসিডেন্ট জিয়ার হত্যার তীব্র নিন্দা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেনঃ প্রেসিডেন্ট জিয়ার মৃত্যুতে জাতি সাধারণ মানুষের কল্যাণে ব্রতী একজন মহান দেশপ্রেমিক ও জাতীয়তাবাদী নেতাকে হারিয়েছে। ডেপুটি স্পীকার বলেনঃ বহু দলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে সংসদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য জনগণ তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। তিনি প্রেসিডেন্ট জিয়ার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বলেনঃ আন্তর্জাতিক শান্তি ও তৃতীয় বিশ্বের নির্যাতীত মানুষের মুক্তির প্রবক্তা হিসেবে তাঁর ভূমিকা ছিল অনন্য ও তাৎপর্যপূর্ণ। বিবৃতিতে তিনি শোকাভিভূত প্রেসিডেন্ট জিয়ার পরিবার-পরিজনের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানান।

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তারের সভাপতিত্বে ৩১ মে, রোববার বঙ্গভবনে অনুষ্ঠিত মন্ত্রী পরিষদের প্রথম আনুষ্ঠানিক সভায় এক শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। তথ্য দফতর পরিবেশিত এই শোক প্রস্তাবে বলা হয়ঃ

"অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি জনাব আবদুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রী পরিষদের এই সভা কিছুসংখ্যক দুষ্কৃতকারীর হাতে চট্টগ্রামে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মর্মান্তিক মৃত্যুতে গভীর দুঃখ ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের অত্যুজ্জ্বল ভূমিকা তাঁর গভীর দেশপ্রেম এবং জনগণের সার্বিক কল্যাণে নিরলস ও নিঃস্বার্থ কর্মপ্রচেষ্টা, গণতন্ত্র ও

শো[illegible]কাবিভূত একমাত্র জীবিত চাচা

আই[illegible]নর শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠায় এবং [illegible]জনগণকে সংগঠিত ও উদ্বুদ্ধ করে আত্মনির্ভরতার মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়[illegible]নর ক্ষেত্রে তার প্রভূত অবদানের কথা এই সভা গর্বের সঙ্গে স্মরণ[illegible] করছে। মুসলিম ও স্বল্পোন্নত দে[illegible]শসমূহের সমস্যাবলী সমাধানে, [illegible] জোটনিরপেক্ষ জাতিসমূহের দাবী-দ[illegible]াওয়ার বলিষ্ঠ প্রবক্তা হিসেবে তাহার প্রশংসনীয় ভূমিকা এবং অ[illegible]ন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জন্য তিনি যে সম্মান ও স্বীকৃতি অর্জন করেছিলেন এই সভা তা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছে। এই সভা সমগ্র দেশবাসীর নিকট আহবান জানাচ্ছে যে, তারা যেন জাতীয় সংহতি সুদৃঢ়করণ এবং কঠোর শ্রমের মাধ্যমে পরলোকগত প্রেসিডেন্ট কর্তৃক নির্দেশিত আদর্শ ও লক্ষ্য বাস্তবায়নে পুনঃ আত্মনিয়োগ করেন। এই সভা মরহুম জিয়াউর রহমানের পত্নী

বেগম জিয়াউর রহমান, তাঁদের সন্তানদ্বয় এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যের প্রতি গভীর মর্মবেদনা জ্ঞাপন করছে এবং প্রার্থনা করছে যে, আল্লাহতায়ালা যেন তাঁদেরকে এই অপূরণীয় ক্ষতি ও শোক বহনের শক্তিদান করেন। এই সভা পরলোকগত রাষ্ট্রপতির রূহের মাগফেরাতের জন্য পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালার নিকট প্রার্থনা করছে।"

জাতীয় সংসদে বিরোধী দলীয় নেতা আসাদুজ্জামান খান গভীর শোক প্রকাশ করে বলেছেন, এতে জনগণ ও দেশের কোন কল্যাণ হবে না। এই হত্যাকান্ডের নিন্দা করে জনাব খান বলেন, এ ধরনের বর্বরোচিত তৎপরতা সর্বদাই জনগণের কল্যাণের জন্য অতীব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে দুর্বল করে।

আওয়ামী লীগ (হাসিনা) নেতা জনগণের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি প্রয়াত প্রেসিডেন্টের পত্নী ও তার পরিবারের সদস্যদের প্রতি শোক ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন। তিনি মরহুম প্রেসিডেন্টের রূহের মাগফেরাত কামনা করেন।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের চেয়ারম্যান প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান দুষ্কৃতকারীদের আক্রমণে মর্মান্তিকভাবে নিহত হওয়ার ঘটনায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ও তার সকল অঙ্গ সংগঠন তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে এই নৃশংস হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে সারাদেশে তীব্র প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের কর্মসূচী গ্রহণের জন্যে পার্টি সর্বস্তরের সকল শাখা ও অঙ্গ সংগঠনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

৩১ মে, পার্টির কর্মসূচীর মধ্যে ছিল বেলা এগারোটায় ঢাকার পল্টন ময়দান, চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানসহ সারাদেশে জানাজা ও শোক মিছিল, পার্টির সব কার্যালয়ে কোরানখানি ও মিলাদ মাহফিল।

জিয়ার প্রাণরক্ষার চেষ্টায় যারা শহীদ হলেন

৩০ মে ভোরে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান দুষ্কৃতকারীদের দ্বারা আক্রান্ত হলে তাঁর প্রাণ রক্ষার জন্যে প্রেসিডেন্টের প্রধান নিরাপত্তা অফিসার প্রেসিডেন্টের গার্ড রেজিমেন্টের একজন অফিসার এবং অপর ১৫ জন সৈনিক প্রাণপণ চেষ্টা করেন।

দুজন অফিসারসহ তাদের ছয়জন শহীদরূপে জীবন উৎসর্গ করেন। তারা চরম বিপদের মুখে তাদের কর্তব্যপরায়ণতা, দেশপ্রেম ও আনুগত্যের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। জাতি শ্রদ্ধা ও গৌরবের সংগে তাদের এই ত্যাগ স্মরণ করবে।

এই শহীদরা হচ্ছেন ঃ প্রেসিডেন্টের প্রিন্সিপ্যাল সিকিউরিটি অফিসার লেঃ কর্নেল এ এস এম মইনুল হাসান, প্রেসিডেন্টের গার্ড রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন আশরাফুল হাফিজ খান, প্রেসিডেন্টের গার্ড রেজিমেন্টের নং ৩৯৪০৮৭৭ নায়েক আবু তাহের, প্রেসিডেন্টের গার্ড রেজিমেন্টের নং ৩৯৫৫১৯৩ সিপাই মোহাম্মদ শাহ আলম, প্রেসিডেন্টের গার্ড রেজিমেন্টের নং ৩৯৫৫৭১৪ সিপাই আবুল কাশেম ও প্রেসিডেন্টের গার্ড রেজিমেন্টের নং ৩৯৭০৩৫৭ সিপাই আবদুর রব।

একমাত্র ক্যাপ্টেন হাফিজের লাশ ছাড়া সকলের লাশ গত সোমবার সন্ধ্যায় পূর্ণ সামরিক মর্যাদায় ঢাকা সেনানিবাসের গোরস্তানে দাফন করা হয়। তাদের জানাজায় সকল শ্রেণীর সৈনিকরা শরিক হন এবং তাদের রূহের মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করেন। ক্যাপ্টেন হাফিজের লাশ জানাজার পর তাঁর আত্মীয়-স্বজনের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

---

৩০ মে, সকালে চট্টগ্রামের মর্মান্তিক ঘটনার সংবাদ শোনামাত্র বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নেতা ও কর্মীরা স্বতস্ফূর্ত বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে শহর প্রদক্ষিণ করে। বিকেলে কর্মীদের এক শোক সমাবেশে মরহুমের রূহের মাগফেরাত কামনা করে তারা অসমাপ্ত বিপ্লবী কর্মসূচী সফল করার লক্ষ্যে এগিয়ে যাবার শপথ নেয়া হয়। রাতে পার্টির কর্মকর্তাগণ পরবর্তী কর্মসূচী নিরূপণের জন্যে জরুরী বৈঠকে মিলিত হন।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের (হাসিনা) সভানেত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ ৩১ মে, প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মর্মান্তিক হত্যাকান্ডের নিন্দা করেন এবং বর্তমান সঙ্কটের মোকাবিলা করার ও তা কাটিয়ে ওঠার জন্য সরকারের প্রতি গণতান্ত্রিক ও নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়া' অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান।

ঢাকায় প্রদত্ত এক বিবৃতিতে আওয়ামী লীগ (হাসিনা) নেত্রী দেশের জনগণের প্রতি 'সহনশীলতার সঙ্গে' এই সঙ্কটময় পরিস্থিতির মোকাবিলা করার আহ্বান জানান। বাংলাদেশ আওয়ামী

লীগের (হাসিনা) দফতর সম্পাদক সংবাদপত্রে এ বিবৃতি পরিবেশন করেন ঃ

বিবৃতিতে সকল স্বাধীনতাপ্রিয় গণতান্ত্রিক শক্তির প্রতি ঐক্যবদ্ধভাবে এ পরিস্থিতি মোকাবিলার আহ্বান জানানো হয়। আওয়ামী (হা) সভানেত্রী বলেন, তাঁর দল হত্যার রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সরকার পরিবর্তনে বিশ্বাস করে। তিনি বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বৈধভাবে নির্বাচিত 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু' শেখ মুজিবুর রহমানের 'নৃশংস হত্যাকান্ড' ও পরবর্তীকালে জেলখানায় চারজন জাতীয় নেতার নৃশংস হত্যাকান্ডের পর আওয়ামী লীগ দেশবাসীর কাছে তার মত ব্যক্ত করে। তিনি বলেন, এই সংকট মুহূর্তে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্ভাব্য হুমকি সৃষ্টিকারী স্বাধীনতা বিরোধী শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকার জন্যে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। সেই সংগে বিশৃংখল ও সমাজবিরোধী শক্তিসমূহ যাতে জনজীবন বিঘ্নিত করতে না পারে সেজন্য তিনি তাদের বিরুদ্ধেও সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। আওয়ামী লীগ নেত্রী মরহুম প্রেসিডেন্টের শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনাও জানান।

৯টি রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ ৩১ মে, দেশের গণতান্ত্রিক অধিকার, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্যে জনগণের প্রতি ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত হওয়ার আহ্বান জানান। তাঁরা বর্তমান পরিস্থিতিতে জনগণের প্রতি সদা সতর্ক থাকার আহ্বানও জানান। সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা আসাদুজ্জামান খানের বাসভবনে অনুষ্ঠিত ন'দলের এক বৈঠকের পর প্রদত্ত একটি বিবৃতিতে এই আহ্বান জানায়। বিবৃতিতে স্বাক্ষরদাতা দলগুলো হচ্ছে ঃ আওয়ামী লীগ (হাসিনা), জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মো), ওয়ার্কার্স পার্টি, বাংলাদেশের

কম্যুনিস্ট পার্টি, ন্যাপ (হারুন), শ্রমিক-কৃষক সমাজবাদী দল, জাতীয় একতা পার্টি ও গণ-আজাদী লীগ। নেতৃবৃন্দ বলেন, গভীর উদ্বেগের সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করছি যে দেশ এখন এক অন্তর্বিরোধের পরিস্থিতি মোকাবেলা করছে।' জনগণের 'সীমিত গণতন্ত্রের' প্রতি তা হুমকি সৃষ্টি করেছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের হত্যাকান্ডের পর চব্বিশ ঘন্টা অতিক্রান্ত হয়েছে। বর্তমান অদ্ভুত পরিস্থিতি অতীতের নৈরাজ্য ও অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের ফলে সৃষ্ট অনিশ্চিত অর্থনৈতিক সংকটের আরও অবনতি ঘটিয়েছে বর্তমান পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে দেশের ভিতরের এবং বাইরের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহই কেবল লাভবান হবে বলে তাঁরা আশঙ্কা প্রকাশ করেন। তাঁরা বলেন, 'অতীতে আমরা বারংবার বলেছি, অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করে কোন দেশেরই কোন কল্যাণ সাধন করা যায়নি। তাঁরা বলেন, এখনও তাঁরা একথা দৃঢ়ভাবেই বিশ্বাস করেন যে নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বর্তমান সংকট নিরসন করা সম্ভব। তাঁরা সংঘর্ষ এড়ানোর জন্যে সকলের প্রতি এই প্রক্রিয়া অবলম্বনের আহ্বান জানান। জনগণের সংগঠিত শক্তিই এই রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে রক্ষা করার একমাত্র উপায় বলে তাঁরা দৃঢ়মত প্রকাশ করেন।

বর্তমান পরিস্থিতিতে জরুরী আইন বলে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহ খর্ব করার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে ৯ দলের নেতৃবৃন্দ মন্তব্য করেন, জনগণের মৌলিক অধিকারসমূহ অক্ষুণ্ণ রাখার এবং তাদের জনসভা অনুষ্ঠানের অনুমতি দেয়ার মাধ্যমে যে কোন মহলের চক্রান্ত প্রতিহত করা সম্ভব। জনগণকে আস্থায় নিয়ে এ সমস্যার সমাধান করা যাবে বলে বিবৃতিতে সবশেষে উল্লেখ করা হয়।

জাসদ-এর সভাপতি মেজর (অবঃ) এম এ জলিল ও সাধারণ সম্পাদক আ স ম আবদুর রব এক বিবৃতিতে বর্তমান পরিস্থিতিতে সর্বস্তরের জনগণের ঐক্য ও সংহতি এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বজায় রাখতে আহ্বান জানান।

বাংলাদেশ মুসলিম লীগের বর্ষীয়ান নেতা খান আবদুস সবুর

খান এক বিবৃতিতে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের কাপুরুষোচিত হত্যাকান্ডে গভীর শোক, দুঃখ ও মানসিক যন্ত্রণার কথা প্রকাশ করেন। মরহুম প্রেসিডেন্টের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে মুসলিম লীগ নেতা বলেন, তিনি ছিলেন উদ্যমী ব্যক্তিত্ব এবং তিনি যে আ... ভাবে দেশের সেবা করতে চেয়েছেন, সে প্রমাণ রেখে গেছেন।

বাংলাদেশের কম্যুনিস্ট পার্টি (সিপিবি) প্রধান মণি সিং বলেন,

আমরা শোকাহত, উদ্বিগ্ন ও দুঃচিন্তাগ্রস্ত। তিনি জানান, এই ধরনের হত্যাকান্ডকে তাঁরা কখনো সমর্থন করেন না। তিনি বলেন, জনগণের নিরাপত্তা যাতে পুরোপুরি নিশ্চিত হয়, তার জন্য প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত ব্যবস্থা সরকারকে গ্রহণ করতে হবে।

ডেমোক্র্যাটিক লীগ প্রধান খন্দকার মোশতাক আহমদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের হত্যাকান্ডে গভীর শোক প্রকাশ করে বলেন, এ ঘটনা দেশের সমস্ত সচেতন নাগরিককে দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তুলেছে। প্রেসিডেন্টের মৃত্যুতে ব্যক্তিগত শোক প্রকাশ করে তিনি বলেন, আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে চেষ্টা করতে হবে, যাতে এভাবে আমাদের মাঝ থেকে আর কাউকে চলে যেতে না হয়। তিনি বলেন, দেশের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা রক্ষা করা এখন সবার দায়িত্ব।

ন্যাপ (মোজাঃ) সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ এমপি অপর এক বিবৃতিতে প্রেসিডেন্ট জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন। তিনি মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে বলেনঃ প্রেসিডেন্ট জিয়ার মর্মান্তিক মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে মর্মাহত।

আওয়ামী লীগ (মিজান) সভাপতি মিজানুর রহমান চৌধুরী গভীর শোক প্রকাশ করে দেশের

স্বাধীনতা বিপন্নকারী এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ জাতিকে জানানোর জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

বাংলাদেশ সাম্যবাদী দল প্রধান

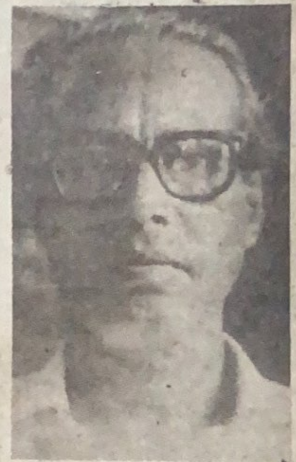

মোহাম্মদ তোয়াহা বলেছেন, জাতি ও জনগণের স্বার্থে এটা করা হয়নি। আমরা জনগণের স্বার্থে সরকার পরিবর্তনে বিশ্বাস করি এবং এ ধরনের হত্যাকান্ডের নিন্দা করি। তিনি বেগম জিয়া ও তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

বাংলাদেশ জামাতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান প্রেসিডেন্ট জিয়ার দুঃখজনক মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

সাবেক প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদুল্লাহ চট্টগ্রামে দুষ্কৃতকারীদের হাতে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমা-

নের আকস্মিক ও দুঃখজনক মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন।

বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক হায়দার আকবর খান রনো ও সম্পাদকমন্ডলীর

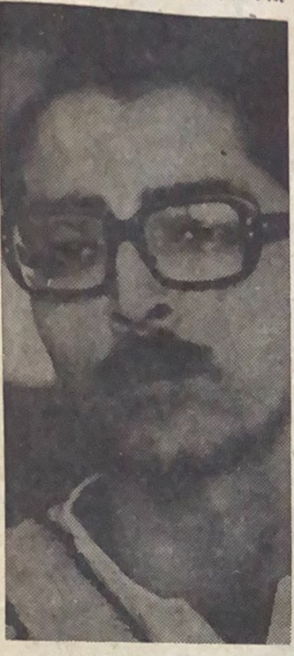

সদস্য রাশেদ খান মেনন ৩১ মে, এক যুক্ত বিবৃতিতে গভীর শোক প্রকাশ করে বলেছেন, প্রেসিডেন্ট জিয়ার নিহত হওয়ার ঘটনায় আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন ও মর্মাহত। আমরা সবসময়েই হত্যা ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতির বিরোধিতা ও নিন্দা করে এসেছি।

তারা বলেন, আমরা মনে করি এ ধরনের পদক্ষেপ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে নস্যাৎ করে এবং জনগণের অধিকারকে সংকুচিত করে। এ ঘটনা দেশকে আরো সংকটাপন্ন করে তুলেছে বলে তারা মন্তব্য করেন।

বাংলাদেশ জনমুক্তি পার্টির সভাপতি মাহফুজ ভূঁইয়া বর্তমান পরিস্থিতি সমগ্র জাতিকে এক অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিয়েছে বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে মুষ্টিমেয় ব্যক্তি যাদের জনগণের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। বিপ্লবী পরিষদ বলে দাবিকারীদের প্রসঙ্গে জনাব ভূঁইয়া বলেন, প্রকৃতপক্ষে বিপ্লবের সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক নেই।

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের চেয়ারম্যান লেঃ কর্নেল (অব) কাজী নুরুজ্জামান বীরউত্তম ৩১ মে, এক বিবৃতিতে বলেন, অপ্রত্যাশিত দুঃখজনক ঘটনায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক বীর মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযোদ্ধা সংসদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের বেদনাদায়ক মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকার্ত ও মর্মাহত। আমরা বিশ্বাস করি হত্যাকান্ডের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উচ্চাভিলাষ কোন অবস্থাতেই জাতির জন্যে কল্যাণকর হয় না। রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা, স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্যে দেশ ও জাতির অতন্দ্র প্রহরী হয়ে সকল মুক্তিযোদ্ধা দেশপ্রেমিক জনগণকে ঐক্যবদ্ধভাবে সজাগ থাকার জন্যে তিনি আহবান জানান।

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কেন্দ্রীয় আহবায়ক কমিটির মাহফুজুর রহমান প্রেসিডেন্ট জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে বলেন, দুষ্কৃতকারী ঘাতকদের এহেন, ঘৃণ্য কাজের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপনের ভাষা আমাদের জানা নেই। এই নজিরবিহীন হত্যাকান্ড বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বিরোধীদের বিদেশী প্রভুদের ইঙ্গিতে সংঘটিত হয়েছে দেশ ও জাতির নিকট তা সুস্পষ্ট। তিনি আরো বলেন, জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধানকে হত্যাকান্ডের হোতারা এদেশের বিকাশমান গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াক নস্যাৎ করতে চায়। তিনি বলেন, দেশ ও জাতির ক্রান্তি-লগ্নে জনগণের অতন্দ্র প্রহরী মুক্তিযোদ্ধারা স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের শত্রু এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রকারীদের কিছুতেই ক্ষমা করবে না। কারণ, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিসংগ্রামের মূল প্রেরণাই ছিলো একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়েম করা। অস্ত্রের সাহায্যে যারা স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব গণতন্ত্র ও সংবিধানকে নস্যাৎ করে ক্ষমতা দখল করতে চায় তাদেরকে দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেয়ার জন্যে সদা প্রস্তুত থেকে বর্তমান শাসনতান্ত্রিক সরকারের কার্যক্রমকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় সহায়তা করতে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি আহবান জানান।

বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক আহমেদ হুমায়ুন ও জনাব রিয়াজউদ্দিন আহমদ এবং ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ইকবাল সোবহান চৌধুরী ও আমানুল্লাহ কবির ৩০ মে ভোরে চট্টগ্রামে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের হত্যাকান্ডের তীব্র নিন্দা করেছেন। ঐদিনই এক যুক্ত বিবৃতিতে তারা প্রেসিডেন্টের মর্মান্তিক মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেন এবং সর্বস্তরের জনগণের প্রতি নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি সম্মান দেখানোর আহবান জানান। হিংসার রাজনীতির কঠোর নিন্দা করে সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ বলেন, এ ধরনের কাজ জাতির জন্য মঙ্গল বয়ে আনতে পারে না। তারা বলেন, আমরা জাতির এই দুর্যোগের মুহূর্তে জাতীয় স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষার জনগণের সঙ্গে একাত্ম। তারা দেশের এই সংকটময় মুহূর্তে সকল রাজনৈতিক দল ও গণসংগঠনগুলোর প্রতি মত পার্থক্য ভুলে ঐক্যবদ্ধ হবার আহবান জানান। তারা মরহুম প্রেসিডেন্টের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করে মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন।

গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা সংসদ সদস্য রাশেদ খান মেনন বলেন, তিনি এ ধরনের হত্যার রাজনীতির বিরোধী। এ ধরনের কার্যকলাপের ফলে গণতন্ত্র ও রাজনীতির প্রক্রিয়া সর্বদাই নস্যাৎ হয়ে যায়। তিনি আরও বলেন, আইন-শৃংখলা রক্ষা এবং জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সরকারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া উচিত।

বাংলাদেশ ইসলামিক ডেমোক্রাটিক লীগের চেয়ারম্যান মওলানা মোহাম্মদ আবদুর রহিম, এক বিবৃতিতে এই কাপুরুষোচিত হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশ করেন।

৩১ মে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ) এক জরুরী সভায় প্রেসিডেন্ট জিয়াকে হত্যার নিন্দা করে বলা হয়, এ ধরনের হত্যাকান্ড সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার পথে অন্তরায়। ভবিষ্যতে এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্যে অবিলম্বে আইনের শাসন ও পূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া শুরু করা উচিত বলে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

ভাসানী ন্যাপ (নুরুর)-এর চেয়ারম্যান নুরুর রহমান ও সম্পাদক আবু জাফর চৌধুরী কতিপয় দুষ্কৃতকারীর হাতে প্রেসিডেন্ট জিয়ার অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন।

ভাসানী স্মৃতি সংসদের সভাপতি নাজমুল হক নান্নু ও সাধারণ সম্পাদক খোরশেদ আলম গভীর শোক প্রকাশ করে বলেন, জাতীয় সমৃদ্ধি, অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট জিয়ার নিরলস প্রচেষ্টা ও ভূমিকা অবিস্মরণীয়। জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের পতাকাকে সমুন্নত রাখতে তারা সুদৃঢ় জাতীয় ঐক্যের আহবান জানান।

৩০ মে, জাতীয় জনতা পার্টির জাতীয় আহবায়ক কমিটির এক জরুরী সভায় মুক্তিযুদ্ধের ১ নং সেক্টর ও পরবর্তী পর্যায়ে 'জেড ফোর্স'-এর অধিনায়ক প্রেসিডেন্ট লেঃ জেনারেল জিয়াউর রহমানের নিহত হওয়ার সংবাদে গভীর শোক প্রকাশ এবং তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন দলের প্রধান জেনারেল (অবঃ) এম এ জি ওসমানী। সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশবাসী বিশেষ করে সরকারী ও সকল বিরোধী দল এবং নেতৃবৃন্দকে সকল ভাবাবেগ ও

উত্তেজনা পরিহার করে জাতীয় স্বার্থকে সকল প্রকার ব্যক্তি এবং দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে রাখতে আহবান জানান হয়। গণতান্ত্রিক এবং রাষ্ট্রীয় সাংবিধানিক মূল্যবোধ সমুন্নত রেখে জাতিকে সঠিক নেতৃত্ব দেয়ার এবং উদ্ভূত পরিস্থিতিতে জনসাধারণ যাতে হয়রানির শিকার এবং জানমালের নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হয়, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে প্রস্তাবে দলমতনির্বিশেষে সকলের প্রতি আহবান জানান হয়। সভায় মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গ ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়।

জাতীয় একতা পার্টি প্রধান সৈয়দ আলতাফ হোসেন বলেন, হত্যা ও গণতন্ত্র পাশাপাশি চলতে পারে না বলে তারা সংসদীয় রাজনীতি এবং সংসদীয় পদ্ধতির মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরে বিশ্বাসী।

এছাড়াও প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডে তীব্র ক্ষোভ, নিন্দা ও শোক প্রকাশ করে যেসব রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের পক্ষ থেকে বিবৃতি দেয়া হয়েছে সেগুলো হচ্ছে—বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (হারুণ), বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (টি আলী) ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী) বাংলাদেশ জাতীয় শ্রমিক লীগ, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন, বাংলাদেশ ওর্কার্স জাতি ফেডারেশন, জনতা ব্যাংক (বাংলাদেশ), জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক চাষীদল, বাংলাদেশ রিপাবলিকান পার্টি, বাংলাদেশ আহলে হাদীস যুব সংঘ, বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ (সিদ্দিকী), বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি, বাংলাদেশ বেসরকারী ছাত্র সমিতি, গুলশান সেন্ট্রাল মসজিদ ঈদগাহ এন্ড বাংলাদেশ যুব মুসলিম লীগ, বাংলাদেশ পিপলস লীগ, তানযীমুল ওলামা বাংলাদেশ, কৃষক শ্রমিক যুব ফ্রন্ট, আদর্শ সমাজতান্ত্রিক পার্টি, প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তি, অগ্রণী ব্যাংক কর্মচারী ইউনিয়ন, রূপালী ব্যাংক এমপ্লয়িজ ফেডারেশন (বাংলাদেশ) ইসলামিক সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিষদ, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শক্তি, বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেসীন কৃষক-শ্রমিক পার্টি ঢাকা রিকশা মজদুর ইউনিয়ন বাংলাদেশ রিকসাচালক সমিতি, বাংলাদেশ প্রাক্তন সামরিক কর্মচারী বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ, শহীদ নজরুল ইসলাম হল সক সমিতি ও ক্রিসেন্ট সোসাইটি বাংলাদেশ ডিএইচএম এস চিকিৎবালাদেশ সর্বদলীয় ইসলামী সংগ্রাম পরিষদ, দারুল জান্নাহ আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর মসজিদ।

বিশ্ব নেতৃবৃন্দের শোক

প্রেসিডেন্ট জিয়ার মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা ও শোক প্রকাশ করে বিভিন্ন দেশ থেকে শোক বার্তা আসা এখনো অব্যাহত রয়েছে। এ পর্যন্ত শোকবাণী গুলো হচ্ছেঃ জাতিসংঘের মহাসচিব ডঃ কুর্ট ওয়াল্ডহেইম তাঁর বাণীতে আতঙ্ক ও দুঃখ প্রকাশ করেন এবং তাঁর সাম্প্রতিক বাংলাদেশ সফর ও মরহুম প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তাঁর বৈঠকের কথা স্মরণ করেন। অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তারের কাছে পাঠানো এই বাণীতে বলেন, প্রেসিডেন্ট জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ সরকার ও জনগণ একজন বিচক্ষণ শাসক এবং বিশ্ব একজন বিশিষ্ট রাজনীতিজ্ঞকে হারালো।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান তাঁর বাণীতে বলেন, প্রেসিডেন্ট জিয়ার হত্যাকাণ্ডে তিনি শোকাহত ও মর্মাহত হয়েছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বস্তুতঃ গোটা বিশ্বের সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য গভীর আগ্রহ, আইনের শাসনের প্রতি নিষ্ঠা এবং আন্তর্জাতিক বিষয় সম্পর্কে প্রজ্ঞার জন্য প্রেসিডেন্ট জিয়ার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল।

সোভিয়েট প্রেসিডেন্ট লিওনিদ ব্রেজনেভ বাংলাদেশের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তারের নিকট প্রেরিত এক শোকবাণীতে চট্টগ্রামে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ডে আন্তরিক শোক জ্ঞাপন করেন।

চীনের ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেসের স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান ইয়ে চিয়েনইং ও প্রধানমন্ত্রী চাও চিইয়াং তাঁদের বাণীতে বলেন, মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের খবর পেয়ে তাঁরা শোকাহত হয়েছেন। তাঁরা চীন সরকার ও জনগণের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ সরকার, জনগণ, ও শোক সন্তপ্ত পরিবার-পরিজনের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ডে শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি প্রেসিডেন্ট জিয়াকে রাষ্ট্রনায়কোচিত দূরদৃষ্টির অধিকারী বলে আখ্যায়িত করেন। অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তারের কাছে এক বার্তায় শ্রীমতী গান্ধী ভারতের সরকার, জনগণ এবং নিজের তরফ থেকে বাংলাদেশের জনগণকে গভীরতম শোক ও সমবেদনা জানান।

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমানের কাছে পাঠানো এক বাণীতে বলেন, প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ডে আমি সন্ত্রস্ত হয়েছি যার নেতৃত্বে ও দৃষ্টান্তে আপনাদের দেশ অগ্রগতি সাধন এবং আন্তর্জাতিক মর্যাদা অর্জন করছিল! একজন বন্ধু ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন রাজনীতিজ্ঞকে হারিয়ে আমরা সকলেই মর্মাহত। অনুগ্রহ করে আমার আন্তরিক শোক গ্রহণ করুন।

পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলর হেলমুট স্মীট ও অন্যান্য নেতা প্রেসিডেন্ট জিয়ার হত্যাকাণ্ডে শোক প্রকাশ করে বাংলাদেশ সরকারের কাছে বার্তা পাঠিয়েছেন। মিঃ স্মীট এই হত্যাকাণ্ডকে বাংলাদেশের জনগণের জন্য ক্ষতি বলে আখ্যায়িত করেন। পশ্চিম জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী হান্স ডিয়েট্রিচ গেনশার তার শোক বার্তায় নিহত প্রেসিডেন্টের রাষ্ট্রনায়কোচিত দূরদৃষ্টির এবং দেশে গণতন্ত্রের বিকাশে তার নিরলস প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন।

জাপানের প্রধানমন্ত্রী বলেনঃ মহামান্য প্রেসিডেন্ট জনাব জিয়াউর রহমান, বীর উত্তম-এর আকস্মিক ও

ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সুহার্তো অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সাত্তারের কাছে শোক বার্তা পাঠিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট ভবনের একজন মুখপাত্র বলেন, প্রেসিডেন্ট সুহার্তো গত বছর বাংলাদেশ সফর করেন। এই হত্যাকাণ্ডে তিনি শোকাহত হয়েছেন। মুখপাত্র বলেন, ১৯৭৭ সালে প্রেসিডেন্ট জিয়ার ইন্দোনেশিয়া সফরের পর থেকে দু-দেশের সম্পর্কের দ্রুত উন্নতি হচ্ছে।

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক তাঁর শোকবাণীতে বলেন, প্রেসিডেন্ট জিয়ার অকাল মৃত্যুতে বাংলাদেশের জনগণ একজন মহান নেতা ও রাষ্ট্রনায়ককে হারাল যিনি অভ্যন্তরীণ জাতির ঐক্য সংহত করার এবং দেশের সমৃদ্ধি আনার জন্য নিরলসভাবে কাজ করেছেন এবং বিশ্বসম্প্রদ্রে বাংলাদেশের মর্যাদাকে নজীরবিহীন পর্যায়ে উন্নীত করেছেন।

প্রেসিডেন্ট জিয়ার মৃত্যুতে পাকিস্তানে দু'দিনের শোক ঘোষণা করা হয়েছে এবং রোববার জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়।

নেপালের রাজা বীরেন্দ্র তাঁর ভাষায় নেপালের একজন মহান বন্ধু ও আন্তর্জাতিক সমঝোতার অগ্রণী ব্যক্তির মৃত্যু বলে অভিহিত করে গভীর শোক প্রকাশ করেন।

কাতারের আমীর শেখ খলিফা বিন হামাদ আল তানি রোববার বাংলাদেশের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তারের কাছে এক তারবার্তায় প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করে একে এক জঘন্য অপরাধ বলে আখ্যায়িত করেন।

জর্দানের বাদশাহ হোসেন এই ঘটনাকে অপরাধমূলক হামলা বলে অভিহিত করেন।

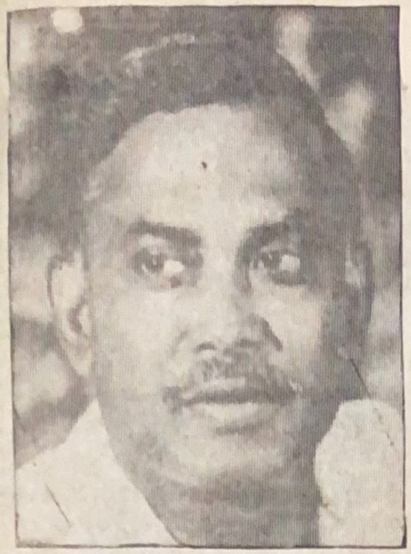

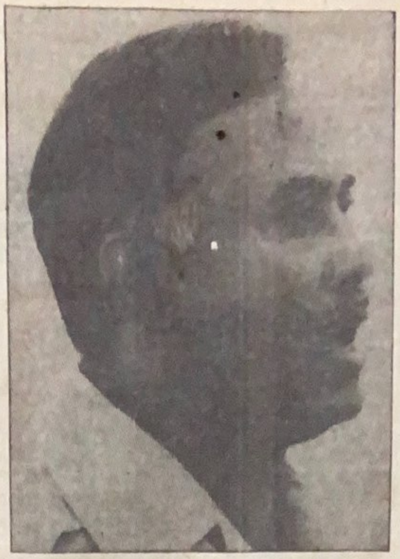

রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে শেষ বিদায়

প্রেসিডেন্ট জিয়া (১৯৩৬-১৯৮১)

চট্টগ্রাম/২৫ মার্চ '৭১–৩০ মে '৮১

যে মাটি থেকে তার উত্থান, যে মাটির চেতনায় জ্বালিয়েছেন স্বাধীনতার অনিঃশেষ দীপ শিখা, সেই মাটিতেই লুটিয়ে পড়েছে তার রক্তাক্ত মৃতদেহ।

প্রেসিডেন্ট জিয়া চট্টগ্রামের মাটিতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন একবার। কখনো কখনো নিয়তিতে বিশ্বাসী। জিয়া সেই মাটিতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একজন অখ্যাত মেজর জিয়া ৭১-এর ২৫ মার্চ একটি ভাষণে প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন স্বাধীনতার দাবানলকে। কালের যাত্রা পথে তিনি উঠে এসেছেন দেশের সর্বোচ্চ আসনে। নেতৃত্ব দিয়েছেন একটি উদ্দেশ্যহীন, জ্ঞাত সভায় অবহেলিত জাতিকে।

এই উপমহাদেশে নেতৃত্ব বিচারে প্রেসিডেন্ট জিয়া নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রম। উত্থানের যে প্রক্রিয়ায় তিনি ক্ষমতায় এসেছেন তা ইচ্ছে করলে ধরে রাখতে পারতেন, কিন্তু জনগণের প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটেছে, তার সিদ্ধান্তে। সেনাবাহিনীর হাত থেকে ক্ষমতা ফিরিয়ে দিয়েছেন জনগণের কাছে। গণতন্ত্রায়ণের প্রক্রিয়ায় প্রেসিডেন্ট জিয়া এক সাহসী সৈনিক।

গণতন্ত্রই সমস্ত ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে একমাত্র কার্যকর ব্যবস্থা, যে ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন প্রেসিডেন্ট জিয়া।

প্রেসিডেন্ট জিয়া সেই ব্যতিক্রমী রাষ্ট্র নায়ক, যিনি ক্ষমতাকে জনগণের খুব কাছাকাছি নিয়ে গিয়েছেন। জিয়াই প্রথম রাষ্ট্র নায়ক যাকে বাংলাদেশের আপামর জনগণ কাছে থেকে দেখেছে।

জাতীয় প্রগতিতে তিনি জোয়ার এনেছিলেন, শেষ দেখে যেতে পারেননি। কিন্তু লক্ষ কোটি প্রাণে বেঁচে থাকবেন প্রেসিডেন্ট জিয়া। বাংলাদেশের স্বাধীনতার মতোই চির জাগরূক থাকবে গণতন্ত্রের প্রতি তার অংগীকার।

মেঝেতে রক্ত, কার্পেট লালে লাল

২৯ মে শুক্রবার সকালে প্রেসিডেন্ট জিয়া পৌঁছুলেন চট্টগ্রাম। চট্টগ্রাম বিমান বন্দরে সেদিন প্রেসিডেন্ট জিয়াকে দেখাচ্ছিল প্রাণবন্ত। অনেক উচ্ছল।

বিমান বন্দর থেকে সার্কিট হাউসে পৌঁছে তিনি চা খেয়েই দলীয় কর্মী ও নেতৃবৃন্দের সংগে একের পর এক আলোচনা করেন।

সেদিনের আলোচনা ছিলো একটু ব্যতিক্রমধর্মী। জানা যায়, চট্টগ্রাম জাতীয়তাবাদী দলের দুটো গ্রুপের মধ্যে বিরাজমান দ্বন্দ্ব নিরসন ও দু'গ্রুপকে একত্রিত করে পার্টিকে সংগঠিত করার জন্যেই মূলতঃ তিনি এসেছিলেন চট্টগ্রামে। তাই তিনি বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন সময়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রুপের কখনো এককভাবে, কখনো সম্মিলিতভাবে, কখনো যৌথভাবে দু'গ্রুপের বক্তব্য অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে শ্রবণ করেন।

দুপুরে স্থানীয় চন্দনপুরা মসজিদে তিনি জুমার নামাজ আদায় করেই 'খাওয়া-দাওয়ার' পর্ব শেষ করে পুনরায় মিটিং শুরু করেন। দলীয় কর্মীদের নিয়ে সভা চলে ৫টা অব্দি।

এর মাঝে হঠাৎ চট্টগ্রাম শহরের বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক,

জনগণের প্রেসিডেন্ট

অধ্যাপকবৃন্দসহ সর্বস্তরের জনগণের সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছে পোষণ করলে বিকেল ৫টায় সে সাক্ষাতকার অনুষ্ঠান শুরু হয়।

সন্ধ্যে ৬টায় পুনরায় দলীয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বৈঠক শুরু করেন প্রেসিডেন্ট জিয়া। এই বৈঠক চলে রাত সাড়ে ১১টা পর্যন্ত। বৈঠক শেষ করেই তিনি কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে নিয়ে রাতের আহার শেষ করেন। আহার পর্ব শেষে পুনরায় দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা চলে রাত ১-৩০ মিনিট পর্যন্ত।

সেদিন রাতে চট্টগ্রামে শুরু হয়েছিল প্রবল বর্ষণ। জ্যৈষ্ঠের এই খরা দিনে এমন মুষলধারে বৃষ্টি চট্টগ্রামে সাম্প্রতিককালে কখনো হয়নি বলে অনেকের ধারণা।

এই বৃষ্টিই সেদিন হয়েছিল কাল। প্রেসিডেন্ট জিয়া চলে গেলেন তার শয়নকক্ষে— রাতের আহার শেষ করেই, চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসের দোতলার ৪নং কক্ষে। যেখানে তিনি ইতিপূর্বে কাটিয়েছেন অনেক রাত।

রাত সাড়ে ৩টার দিকে বৃষ্টিসহ বজ্রপাত হচ্ছিল। হত্যাকারীদের জন্যে বৃষ্টি ও বজ্রপাত যেন আশীর্বাদ হয়ে এসেছিল। সার্কিট হাউসের দু'পাশে শর্ট লাইনের আলো জ্বালিয়ে নীল পোশাক পরিহিত কমেকজনের একটি দল রকেট ও মর্টার নিক্ষেপ করতে করতে সার্কিট হাউসের ভেতরে ঢুকে পড়ে। পুলিশের একজন কনস্টেবল রাইফেল তুলে বাধা দিলে গুলি করে তার মাথার খুলি উড়িয়ে দেয়া হয়। অন্যান্য যেসব পুলিশ বাহিনীর সদস্য বাধা দেয়ার চেষ্টা করেন তাদের সবাইকে হত্যা করা হয়।

প্রচন্ড গোলাগুলির শব্দে প্রেসিডেন্ট চার নম্বর কক্ষের বাইরে চলে আসেন। ইতিমধ্যে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসে কয়েকজনএ এবং সিঁড়ির কাছেই তাকে ব্রাশ ফায়ার করে হত্যা করে।

জানা গেছে সমস্ত ঘটনা ঘটে ৩২ মিনিটের মধ্যে। অনুমান করা হয় প্রেসিডেন্টকে হত্যা করা হয় রাত ৪টা ২ মিনিটে। এরপরও ঢাকা চট্টগ্রাম ট্রাঙ্ক লাইন খোলা ছিল। কিছু পর তা বন্ধ হয়ে যায়।

শনিবার সকাল ৮টায় ঘাতকরা ৫টি জীপে করে পুনরায় সার্কিট হাউসে আসে এবং প্রেসিডেন্ট, চীফ সিকিউরিটি অফিসার লেঃ কর্নেল এহসান ও ক্যাপ্টেন হাফিজের লাশ নিয়ে চলে যায়। আরো ৬টি লাশ সার্কিট হাউসের সামনেই পড়ে থাকে। আহত কয়েকজন পুলিশ ও সৈনিকের দেহও পড়ে থাকে। এদের মধ্যে দু'জন পরদিন চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রাণত্যাগ করেন।

রাংগুনিয়ায় প্রেসিডেন্ট জিয়ার লাশ দাফন করার সময় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের তিনজন ছাত্র তা দেখে ফেলেন। কিন্তু সে সময় তারা এটা অনুমানই করতে পারেননি। ভেবেছেন সামরিক বাহিনীর লোকেরা ট্রেঞ্চ খুঁড়ছে।

৩০ মে শনিবার

চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত 'বিপ্লবী পরিষদের' ঘোষণায় চট্টগ্রামের জনগণ স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। চট্টগ্রামের জনজীবনের চাঞ্চল্য থেমে যায়। প্রাণহীন চলন্ত শরীরের মত চট্টগ্রামের নাগরিক জীবন যাত্রা চলতে থাকে। শোক বিহবল মানুষ ভীতি জনিত দ্বিধা নিয়ে জড়ো হতে থাকে সার্কিট হাউসের সামনে। মানুষ যেখানেই রক্তের দাগ দেখেছে সেখানেই ভিড় করতে থাকে। সন্দেহ শংকার কালো ছায়া গ্রাস করে সমগ্র নগরজীবন।

৩১ মে রোববার

প্রেসিডেন্ট জিয়ার মৃত্যুসংবাদ শুনে চট্টগ্রামের শিল্পাঞ্চল পার্শ্ববর্তী গ্রাম গ্রামান্তর থেকে মানুষ জড়ো হতে থাকে লালদীঘি ময়দানে। এরমধ্যে চট্টগ্রামের পৌর কমিশনার জনাব মাহমুদ, শ্রমিক দল নেতা লিয়াকত আলী যুবদল নেতা রমিজ আহমেদ এবং নাজিমউদ্দিন জানাজা নামাজ পড়ার প্রস্তুতি নেন। হঠাৎ 'মিলিটারী আসছে' শব্দে কাতারবন্ধ মানুষ ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে এবং পার্শ্ববর্তী পুকুরের পাড়ে জানাজা আদায় করে। এরপর একই স্থানে আরও তিনবার (মোট চারবার) গায়েবানা জানাজা নামাজ পড়েন শোকার্ত জনতা। জানাজার পর হত্যার প্রতিবাদে একটি মিছিলও বের করা হয় বলে জানা গেছে।

চট্টগ্রামের সাংবাদিকরা জানান জনৈক লেঃ কর্নেল মতিউর রহমান এবং জনৈক মেজর হাশেমী চট্টগ্রামের বিভিন্ন সংবাদপত্র কার্যালয়ে যান এবং বিদ্রোহীদের পক্ষে প্রতিবেদন সম্বলিত পত্রিকা প্রকাশ করতে বলেন।

এদিন দুপুরে মেজর জেনারেল মঞ্জুর কোর্ট বিল্ডিংয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণ দেন। সঙ্গে তার একজন সহযোগীও ছিলেন। জানা গেছে সাংবাদিক সম্মেলনে মাত্র দু'জন সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। আর একজন সাংবাদিক সম্মেলনস্থলে যান কিন্তু তার আগেই সম্মেলন শেষ হয়ে যায়।

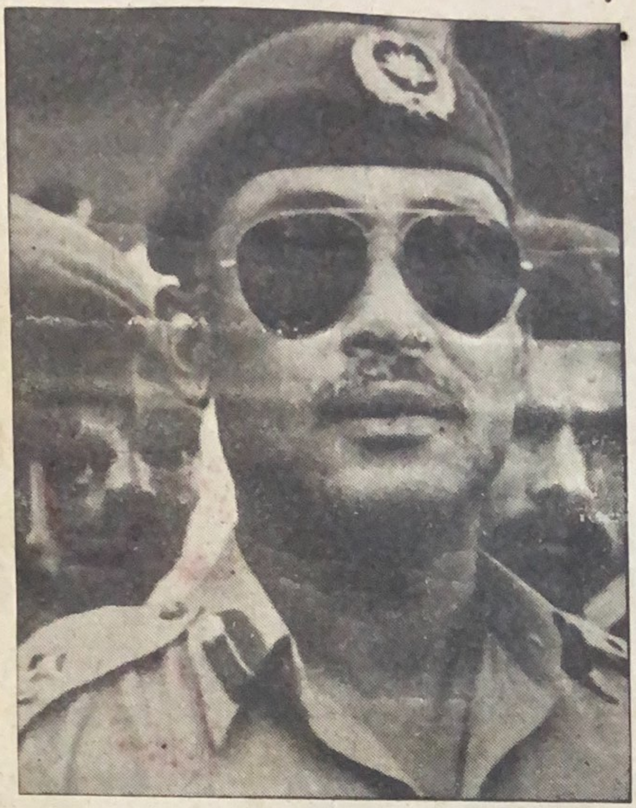

৭ই নভেম্বর ৭৫

এ সম্পর্কে চট্টগ্রামের একটি দৈনিকে বলা হয় 'গতকাল জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে তিনি সরকারী আধা সরকারী, কর্পোরেশন শান্তি শৃংখলা রক্ষাকারী ও আইন প্রয়োগকারী বিভাগের পদস্থ কর্মচারী এবং সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করছিলেন।'

১ জুন

সকালে বিদ্রোহী বাহিনীর পলায়নের খবর শোনা মাত্র শোক ক্ষোভের মিশ্র আবেগে আপ্লুত চট্টগ্রামবাসী লাশের খোঁজে সেনানিবাসের দিকে দৌড়াতে শুরু করেন। অগনিত বিক্ষোভ মিছিলে ছেয়ে যায় সমস্ত সড়ক।

ইতিমধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের তিনজন ছাত্র খালেদ শোয়েব ও ফরিদ খবর নিয়ে এলো লাশ পুঁতে রাখা হয়েছে। খবর পেয়ে সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা স্থানীয় প্রশাসন এবং বিএনপির নেতৃবৃন্দ রাঙ্গুনিয়া ছুটে যান।

যেখানে লাশ দাফন করা হয়

চট্টগ্রাম থেকে ১৬ মাইল দূরে রাঙ্গুনিয়ার পাহাড়তলী এলাকায় চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কাছে কাতাল শাহ মাজারের মসজিদের মাত্র ৪০০ গজ দূরে গত শনিবার দুপুর ১২টায় দুটো ভ্যান ও ১টি এম্বুলেন্সে করে ৯ জন সামরিক বাহিনীর সদস্য গিয়ে ঐ মসজিদের ইমামকে ডেকে নেয়। পথের পাশ থেকে তারা ৩ জন শ্রমিককে নেয় মাটি খোড়ার জন্যে।

উক্ত মসজিদের ইমামকে দিয়ে জানাজা পড়িয়ে তারা প্রেসিডেন্ট ও দু'জন দেহরক্ষীর লাশ একই সঙ্গে একটি ত্রিপল মুড়ে কবর দিয়ে দেয়।

বিক্ষুব্ধ চট্টগ্রামবাসী

চট্টগ্রামের জনগণ স্বতস্ফূর্তভাবে লাশ উদ্ধার করলেও তাদের

স্টেডিয়ামের শিশু মেলায়

১ মে '৭৬

লাশ না দেখিয়ে ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হলে তারা হয়ে পড়ে বিক্ষুব্ধ।

উল্লেখ্য লাশ তোলেন সম্পূর্ণভাবে উক্ত ৩জন ছাত্র ও স্থানীয় জনসাধারণ।

তথাকথিত বিপ্লবী পরিষদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

৩০ মে রাতে প্রেসিডেন্ট জিয়ার হত্যার খবর শুনেই চট্টগ্রাম সেনানিবাসের বহু জোয়ান বিদ্রোহ করে। এদের অনেকেই বিভিন্ন পাহাড়ে পালিয়ে যায়। অন্ধকার নেমে এলে তারা সেখান থেকে নেমে এসে স্থানীয় জনসাধারণের সংগে সাক্ষাত করেন অত্যন্ত গোপনে। তাদের কাছে পাওয়া খবরে জনা গেছে অনেকেই তখন বন্দী হয়েছিল বিপ্লবী পরিষদের হাতে।

বিদ্রোহী বাহিনী পলায়নের নেপথ্য কাহিনী

চট্টগ্রামে পাওয়া খবরে জানা যায় বিদ্রোহীরা শুভপুরের নিকট যে বিরাট বাহিনীকে যুদ্ধ প্রস্তুতি হিসেবে মোতায়েনের চেষ্টা করে তারা সবাই জনৈক অফিসারের নেতৃত্বে শুভপুর ব্রিজ পার হওয়ার সংগে সংগেই 'আমরা দুঃখিত' বলে বেতারে বিদ্রোহীদের জানিয়ে দেয়। ফলে সংশ্লিষ্ট গ্রুপের কমান্ডিং অফিসার ও অন্যান্য নেতারা হতভম্ভ হয়ে পেছনের দিকে দ্রুতগতিতে সেনানিবাসে চলে আসে। তাদের এই ব্যর্থতার কথা শুনেই মেজর জেনারেল মঞ্জুর পলায়ন করার প্রস্তুতি নেয় রাত ৩টার দিকে।

সপরিবারে অন্যান্য সহযোগীসহ দুটো সাদা টয়োটা গাড়িতে করে পালিয়ে যাবার সময় প্রহরারত সিপাহী তাদের লক্ষ্য করে গুলী করে। একটি সূত্রের খবর গুলীতে হত্যাকারীদের দু'জন সংগী একজন লেঃ কর্নেল, জনৈক মেজর জামিল আহত হয়। অবশ্য এদের ফটিকছড়িতে ফেলে গেলে তারা সেখানে জনতার হাতে ধরা পড়ে।

দুষ্কৃতকারী দলের নেতা মেজর জেনারেল আবুল মঞ্জুর ধরা পড়েন ফটিকছড়ি থানার পাইন্দং ইউনিয়নের খৈয়াছড়া চা-বাগানে।

চট্টগ্রামের একটি দৈনিক এক প্রতিবেদনে জানায়, 'মেজর জেনারেল মনজুর জীপযোগে তার স্ত্রী, তিন ছেলে ও মেয়ে এবং কর্নেল দেলওয়ার নামক অপর একজন সামরিক অফিসারের স্ত্রী ও তিন ছেলে মেয়ে সহ মোট ৯ জন পাইনদং গ্রামে পৌঁছেন। পরে তারা জীপ থেকে নেমে পশ্চিমে পাহাড়ের দিকে যায় এবং খৈয়াছড়া নামক একটি চা বাগানে গিয়ে জনৈক কুলির ঘরে আশ্রয় নেয়।

ইতিপূর্বে তার পালিয়ে যাওয়ার সংবাদের সূত্র ধরে হাটহাজারী থানার সার্কেল ইন্সপেক্টর মোস্তফা গোলাম কুদ্দুস এন, এস, আই বিভাগের জনাব সত্তার ও আজাদ এবং ফটিকছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ কয়েকজন কনষ্টেবল উক্ত বাগানে পৌঁছে কুলির ঘর ঘেরাও করেন। সে সময় মেজর জেনারেল মনজুর তার ছেলে মেয়েদের ভাত খাওয়াচ্ছিল। এমতাবস্থায় ফটিকছড়ি থানার কনষ্টেবল সুধীর তাকে ধরার জন্য এগিয়ে গেলে মনজুর তার দিকে লক্ষ্য করে চাইনীজ রাইফেল তাক করে ধরে। সুধীর তড়িৎ গতিতে মেজর জেনারেল মনজুরের এক কন্যাকে বুকে জড়িয়ে ধরে। এতে মনজুর রাইফেল নামিয়ে ফেলে এবং তাদের নিকট আত্মসমর্পণ করে। পরে বিকেল পাঁচটার সময় জনৈক কন্ট্রাক্টরের জীপযোগে তাদের সকলকে হাটহাজারী থানায় নিয়ে আসা হয় এবং সেখানে অসংখ্য লোক থানার সামনে জমায়েত হয়। সংবাদ পেয়ে উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাগণ থানায় উপস্থিত হন। এরপর গতরাত দশটার সময় সামরিক বাহিনীর একটি দল হাটহাজারী থানায় উপস্থিত হয়ে মেজর জেনারেল মঞ্জুরসহ সকলকে সেনা নিবাসে নিয়ে যায়।

পাইনদং এলাকার গ্রামবাসীদের কাছ থেকে জানা গেছে, গতকাল সকাল আটটার সময় ৬০-৭০ জন সশস্ত্র সৈনিক সহ ৬ জীপ পাইনন্দং পৌঁছে। তারা সকলেই রাস্তার উপর গাড়ি থেকে নেমে যায় এবং তিনজন অফিসারের সংগে কথা কাটাকাটি করে। এক পর্যায়ে উত্তেজিত সৈনিকগণ লাইন করে তিনজন অফিসারকে গুলি

খাল খননে

চীনের প্রধানমন্ত্রী হুয়া ক্যোফ্যাং-এর সঙ্গে

ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস গান্ধীর সঙ্গে

কমনওয়েলথ সরকার প্রধানদের সঙ্গে (বাম থেকে দ্বিতীয়)

করে হত্যা করে। এর পর সকলেই নিকটস্থ পাহাড়িয়া এলাকায় পালিয়ে যায়—এই সংবাদ পাওয়ার পর পুলিশ সেখানে উপস্থিত হয়ে তিনজন সামরিক অফিসারের মৃত দেহ মানিকছড়ি থানায় নিয়ে যায়। কিন্তু এই সংবাদ লেখার সময় পর্যন্ত তাদের কোন পরিচয় পাওয়া যায়নি।'

রহস্যজনক মাইক্রোবাস ও নীল গাড়ি

প্রেসিডেন্টকে যেদিন রাতে হত্যা করা হয় সেদিন দুটো মাইক্রোবাসকে অত্যন্ত সন্দেহজনকভাবে ঘোরা ফেরা করতে দেখা যায় অকুস্থলের চারপাশে। এবং নীলরং-এর কারকে একটি দূতাবাস-সহ বিভিন্ন এলাকায় সন্দেহজনকভাবে বিচরণ করতে দেখা যায়।

এছাড়া সামরিক বাহিনীর কয়েকটি গাড়িকে একইভাবে সন্ধ্যা থেকে দেখা গিয়েছে।

রেডক্রস ভবনের সভা

একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে যে রাতে প্রেসিডেন্টকে হত্যা করা হয় সেদিন সার্কিট হাউসের পার্শ্বে চট্টগ্রামের রেডক্রসস্থ সদর দফতর 'আলকরিম' বিল্ডিং-এ কারা একটি সভা করে। সভায় উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের নাম এবং সভার বিষয় জানা যায়নি।

পিএলও প্রধান ইয়াসির আরাফাতের সঙ্গে

শ্রীলংকায় জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে '৭৬

ইরানের প্রাক্তন শাহের সঙ্গে

ড্রাইডক

গতমাসে ড্রাইডক উদ্বোধনের কয়েকদিন পূর্বে কন্ট্রোল রুমের প্যানেল বোর্ডে অত্যন্ত শক্তিধর একটি প্লাস্টিক বোমা পাওয়া গিয়েছিল। এই প্যানেল বোর্ডে সুইচ টিপে প্রেসিডেন্টের ড্রাইডক উদ্বোধন করার কথা ছিল।

প্রেসিডেন্ট কেন চট্টগ্রামে গিয়েছিলেন

গতমাসে প্রেসিডেন্ট জিয়া চট্টগ্রাম ড্রাইডক উদ্বোধন করেন। সেদিন প্রেসিডেন্ট চট্টগ্রাম পৌঁছানোর আগে বিমান বন্দরে বিএনপি'র দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। পুলিশ তা নিয়ন্ত্রণ করে। প্রেসিডেন্ট এ খবর পেয়ে ড্রাইডকে অল্প সময় অবস্থান করেন।

ঢাকায় এসে এ ব্যাপারে ফয়সালা এবং ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে তিনি কয়েকটি বৈঠক করেন বেল জানা যায়। এ ব্যাপারে চট্টগ্রামের বিভিন্ন বাহিনীর রিপোর্ট প্রদানের নির্দেশ দেন। একসূত্রে জানা যায় ২৯ মে রাতে এসব রিপোর্ট তার কাছে পেশ করা হয়। অন্য একসূত্রে জানা যায় এ ব্যাপারে ৩০ মে চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণের কথা ছিল।

চট্টগ্রামের জনমনে অসন্তোষ ও প্রশ্ন

চট্টগ্রামবাসীদের প্রেসিডেন্ট জিয়ার মৃতদেহ না দেখানোয় তারা কর্তৃপক্ষের উপর অসন্তুষ্ট। তাদের মনে প্রশ্ন রয়েছে প্রেসিডেন্টের লাশ চার ঘন্টা সার্কিট হাউসে পড়ে থাকলেও কেউ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি কেন? একজন বেসামরিক লোক যদি গোলাগুলির মধ্যে ক্রল করে পালিয়ে আসতে সক্ষম হতে পারেন তবে আর কেউ সে ববস্থা গ্রহণ করেননি কেন? ঘুমন্ত প্রেসিডেন্টের কক্ষ প্রহরার জন্যে কোন শান্ত্রি মোতায়েন করা হয়নি কেন? হয়ে থাকলেও তাদের সরালো কে?

চট্টগ্রামের স্থানীয় প্রশাসনের কেউ কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিদ্রোহীদের সহযোগিতা কেন করেন? যেখানে অসহযোগিতার দৃষ্টান্ত রয়েছে?

চট্টগ্রামবাসীদের আরেকটি প্রশ্নঃ চট্টগ্রামের টেলিভিশন রীলে স্টেশন থেকে বিদ্রোহীদের নির্দেশনামা হাতে লিখে কেন প্রদর্শন করা হয়? চট্টগ্রামবাসীর ধারণা একাজটি করা যাবে এটা বিদ্রোহীদের জানা ছিল না।

সার্কিট হাউস

এখন সার্কিট হাউসকে মনে হয় ৭১-এ বিধ্বস্ত সার্কিট হাউস। রকেট শেলে বিধ্বস্ত। দরজা জানালা ভেঙ্গে চুরমার। নীচের হল রুমের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। সোফা সেট গুলির আঘাতে ঝাঝরা। টেলিফোন সেট ভেঙ্গে খান খান। পুরো মেঝেতে রক্ত। কার্পেট লালে লাল।

আমি জিয়া বলছি

৭১-এর ২৫ মার্চ পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী যখন বাংলাদেশে ইতিহাসের নৃশংসতম গণহত্যাযজ্ঞের সূচনা করেছে, গোটা জাতি যখন নেতৃত্বহীন অবস্থায় স্তম্ভিত, সন্ত্রস্ত, দিশেহারা তখন চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে একটি কন্ঠস্বর অলৌকিক প্রেরণায়

পার্লামেন্টের অধিবেশনে ভাষণ দিচ্ছেন

সঞ্চার করেছিলো সবার মাঝে। 'আমি মেজর জিয়া বলছি'—অতি সাধারণ, অত্যন্ত নিরাভরণ এই বাক্যটির মাধ্যমে যে বেতার ভাষণের সূচনা সেটা শুধু সেনাবাহিনীর দেশপ্রেমিক সদস্যদের ভেতর নয়, গোটা জাতির ভেতর প্রচণ্ড সাহস আর উদ্দীপনা ছড়িয়ে দিয়েছিলো। এইভাবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একজন সাধারণ অফিসার অসাধারণ এক ব্যঞ্জনা নিয়ে ইতিহাসের পাতায় আবির্ভূত হলেন। একটি রাজনৈতিক মহল থেকে পরবর্তী কয়েক বছরে অক্লান্ত চেষ্টা চালানো হয়েছে ইতিহাসের পাতা থেকে সেই নাম মুছে ফেলার কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। ১৯৭৫-এর ৭ নবেম্বর দেশ ও জাতির এক চরম সংকটজনক পরিস্থিতিতে আবার সেই কণ্ঠস্বর 'আমি জিয়া বলছি'—আবারও প্রচণ্ড উদ্দীপনা ও আশার মন্ত্র শোনালো দিশেহারা মানুষদের। বাংলাদেশের ইতিহাসের দুই ক্রান্তিলগ্নে জিয়াউর রহমান আবির্ভূত হলেন ঝড়ে বিধ্বস্তপ্রায় জাতির কাণ্ডারী রূপে।

১৯৭৫-এর ৭ নবেম্বর সিপাহী-জনতার অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বাকশালী ক্ষমতা দখলের চক্রান্তকে পর্যুদস্ত করে জিয়াউর রহমান আবির্ভূত হয়েছেন নেতৃত্বহীন দরিদ্র একটি জনগোষ্ঠীর অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা হিসেবে যার স্বীকৃতি তিনি পেয়েছেন বর্ষীয়ান জননেতা মওলানা ভাসানীর কাছ থেকে। সেই সংকট মুহূর্তে মওলানা ভাসানী সব সময় তাঁকে সমর্থন করে গেছেন যে, মওলানা সারাজীবন সরকার-বিরোধী রাজনীতি করেছেন।

১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যু বাংলাদেশের পেটি বুর্জোয়া—বুর্জোয়া রাজনীতিতে শুধু শূন্যতার সৃষ্টিই করেনি চরম নৈরাজ্যিক এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। কারণ যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে শেখ মুজিবুর রহমানই ছিলেন এই রাজনীতির শেষ অবলম্বন। তাঁর আগে এ কে ফজলুল হক বা সোহরাওয়ার্দীর ক্ষমতা ছিলো জনগণকে তাঁদের পক্ষে রাখার। শেখ মুজিবের মৃত্যু যে শূন্যতার সৃষ্টি করে সেই শূন্যতা জিয়াউর রহমান শুধু পূরণই করেননি গোটা জাতিকে বাকশালী আমলের নৈরাজ্য থেকে মুক্ত করে নতুন এক সম্ভাবনার সূত্রপাত করেন রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের মাধ্যমে।

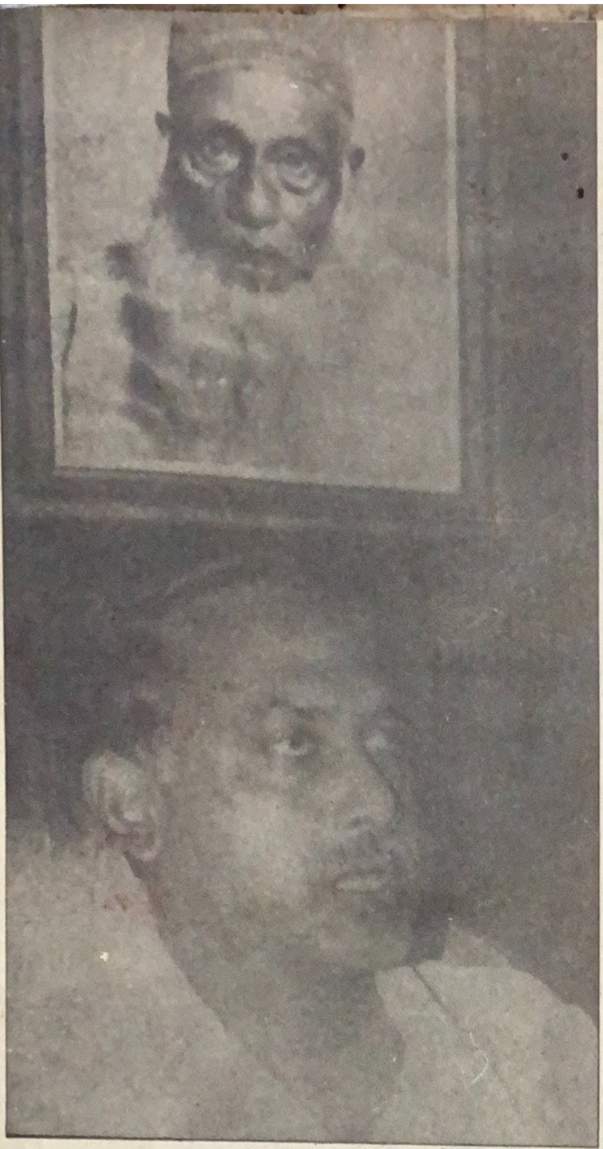

বিচিত্রার ক্যামেরায়

কবি নজরুলের মরদেহের পাশে ফাতেহা পাঠ করছেন

গার্ল গাইডদের অনুষ্ঠানে

রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে তাঁর দক্ষতা তিনি প্রেসিডেন্ট হওয়ার প্রথম বছরই প্রমাণ করেছেন। সামরিক বাহিনীর নিয়মানুবর্তিতা ও শৃংখলা তিনি বেসামরিক প্রশাসনেও প্রবর্তন করেন। জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি তিনি শুধু দৃঢ়ভাবে অবলম্বনই করেননি বরং জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনসহ সকল আন্তর্জাতিক ফোরামে তিনি তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশসমূহের বলিষ্ঠ মুখপাত্র হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করেন। বিশ্ব সভায় এক মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন হতলাঞ্ছিত দরিদ্র বাংলাদেশকে।

দেশে বিরাজমান রাজনৈতিক সংকট মোচনের জন্য জিয়াউর রহমান নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের উদ্যোগ নেন। প্রথমে তাঁর অনুপ্রেরণায় গঠিত হয় জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল, পরে আরো কয়েকটি দলের সমন্বয়ে গঠন করেন জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট এবং এই ফ্রন্টই পরবর্তীকালে জাতীয়তাবাদী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে যার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব ছিলো জিয়াউর রহমানের।

রাজনীতিবিদ হিসেবে জিয়াউর রহমান এদেশের শহরকেন্দ্রিক, শহরজীবী, বৈঠকখানা বিলাসী রাজনীতিবিদদের জন্য যে মস্ত বড় চ্যালেঞ্জ ছিলেন এটাও তিনি এক বছরের ভেতরই প্রমাণ করেছেন এবং এটাও প্রমাণ করেছেন রাজনীতিবিদ হিসেবে তাঁর দক্ষতা সন্দেহাতীত। তাঁর সর্বগ্রাসী ব্যক্তিত্ব এবং বিচক্ষণতার কারণে আওয়ামী লীগসহ প্রায় প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল বিভক্ত হয়েছে এবং জাতীয়তাবাদী দলের শক্তি বৃদ্ধি করেছে।

রাষ্ট্রপ্রধান ও রাজনীতিবিদ হিসেবে জিয়াউর রহমান সংক্ষিপ্ততম সময়ে দেশের যত এলাকা সফর করেছেন, যত ভাষণ দিয়েছেন, উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে যে রকম কায়িকভাবে অংশ নিয়েছেন এদেশের কোন রাষ্ট্রপ্রধান, কোন রাজনীতিবিদ অতীতে তা করেননি। তাঁর অসাধারণ কর্মক্ষমতা, সততা ও ব্যক্তিত্ব শুধু দেশের ভেতরই নয়, দেশের বাইরে আন্তর্জাতিক, নেতৃবৃন্দ ও গণমাধ্যমসমূহ কর্তৃক অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকৃত হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান রাজনীতিবিদ হিসেবে প্রথম বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছেন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকালে ভারতআশ্রিয়পন্হী আওয়ামী বাকশালী মহল থেকে। অবশ্য আওয়ামী বাকশালীরা ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর থেকেই প্রেসিডেন্ট জিয়ার বিরোধিতা করছিলো। ৭ নবেম্বরের সিপাহী-জনতার অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তিনি প্রথম এই চক্রকে আঘাত করেন। ৭৮ সালে প্রেসিডেন্ট হিসেবে বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়ে এই চক্রকে তিনি দ্বিতীয় আঘাত করেন। তৃতীয় আঘাত করেন ৭৯ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তাঁর দলকে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করানোর মাধ্যমে।

১৯৮০ সালের শেষ দিকে ৭১-এর পরাজিত শত্রু সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক শক্তির পুনরুত্থান সম্পর্কেও জিয়াউর রহমান সজাগ ছিলেন এবং এদের তৎপরতাকে প্রতিহত করার জন্য বিভিন্ন সময় আহবান জানিয়েছেন। স্বাধীনতার পূর্বাপর শত্রুকে রাজনৈতিকভাবে প্রেসিডেন্ট জিয়া অত্যন্ত দক্ষতার সংগে মোকাবিলা করতে পেরেছেন বলেই তাঁর বিরুদ্ধে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো সভা, সমাবেশ ও বিবৃতিতে অনেক কথা বললেও তাঁর বিরুদ্ধে কার্যকর কোন আন্দোলন তাদের পক্ষে গত ছয় বছরে গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। যে কারণে তাঁকে ক্ষমতা থেকে অপসারণের জন্য তাঁর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ সমূহকে বার বার সামরিক অভ্যুত্থানের আশ্রয় নিতে হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট জিয়ার মৃত্যুতে গোটা দেশবাসী যেভাবে শোকাহত হয়েছে ইতিপূর্বে বাংলাদেশের কোন রাষ্ট্রপ্রধান বা রাজনীতিবিদের

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পোস্টার

মৃত্যুতে তেমনটি দেখা যায়নি। তাঁর মৃত্যুতে গোটা বিশ্ববাসী যে শোক প্রকাশ করেছেন সেটাও অভূতপূর্ব। গুরুত্বপূর্ণ সকল দেশের রাষ্ট্রপ্রধান প্রেসিডেন্ট জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। বিশ্বের সকল গুরুত্বপূর্ণ গণমাধ্যমে প্রেসিডেন্ট জিয়ার আকস্মিক মৃত্যু প্রধান সংবাদ হিসেবে অবস্থান করেছে এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত।

১ জুন ঢাকা স্টেডিয়ামে প্রেসিডেন্ট জিয়ার গায়েবানা জানাজায় ভাষণ দিতে গিয়ে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তার সাত্তার বলেছেন 'জীবিত অবস্থায় মানুষের দোষত্রুটি করা অস্বাভাবিক কিছু নয়। প্রেসিডেন্ট জিয়া আপনাদের কাছে কোন দোষ ত্রুটি, অপরাধ করে থাকলে আজ ক্ষমা করে দেবেন।' প্রেসিডেন্ট জিয়া সকল দোষত্রুটির ঊর্ধ্বে ছিলেন একথা আমরা বলি না। কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে তিনি যখন কর্মরত ছিলেন, কোন দুর্নীতি তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি একথা তাঁর বিরোধী মতানুসারীরাও স্বীকার করেন। দুর্নীতিগ্রস্ত এই সমাজে প্রেসিডেন্ট জিয়া নিজেকে দুর্নীতিমুক্ত রাখতে পেরেছেন যা কিনা তাঁর আগে এদেশে অন্য কারো পক্ষে সম্ভব ছিলো না। হয়তো কখনো তিনি কোন ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে, কিম্বা হয়তো কোন অসময়োচিত পদক্ষেপ— যা পরিহার করা হয়তো সম্ভব বা অসম্ভব ছিলো কিন্তু তাঁর সততা সম্পর্কে কারো সন্দেহের অবকাশ ছিলো না। তিনি অনেক কিছুই করতে পারেননি কিন্তু তিনি পারবেন এই বিশ্বাস তাঁর প্রতি সাধারণ মানুষের ছিলো। এই বিশ্বাস অর্জনই হচ্ছে যে কোন রাষ্ট্র-

নায়কের প্রধান সাফল্য। প্রেসিডেন্ট জিয়া সেই বিরল সাফল্যের অধিকারী ছিলেন।

প্রেসিডেন্ট জিয়ার মৃত্যু এদেশের রাজনীতিতে এবং রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে যে শূন্যতার সৃষ্টি করেছে এ সুযোগ নিতে চাইবে তাঁর শত্রুরা। স্বাধীনতার পূর্বাপর সকল শত্রুই চাইবে একটি বিশৃংখলা সৃষ্টি করে ক্ষমতা দখল করতে। এই শত্রুদের প্রতিরোধের জন্য আজ প্রয়োজন জাতীয় ঐক্যের। এই সংকটমুহূর্তে প্রতিটি দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তিকে ঐক্যবদ্ধভাবে ভাবতে হবে কিভাবে উত্তরণের লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া যায়। প্রেসিডেন্ট জিয়া যে কাজ অসমাপ্ত রেখে গেছেন সে কাজ সমাপ্ত করার দায়িত্ব গোটা জাতির উপর অর্পিত হয়েছে এবং সে কাজ হচ্ছে বিশ্বের এই পরনির্ভর দরিদ্রতম দেশটিকে স্বনির্ভর ও সমৃদ্ধিশালী দেশ হিসেবে গড়ে তোলা।

কমলের স্মৃতি

কিছুটা ভেজা মনে হলো তাঁর চোখ। কিছু বলতে চাইছিলেন। বলতে পারলেন না। চুপ করে থাকলেন। শুধু বললেন, কিছু মনে পড়ছে না। এরপর বললেন, কমল ছিল লাজুক স্বভাবের লোক। এরপর আবার বললেন, আমি কিছু বলতে পারবো না। এভাবেই বলতে গিয়ে থেমে যাচ্ছিলেন তার এক চাচাতো ভাই ফওজুল করিম। জিয়ার

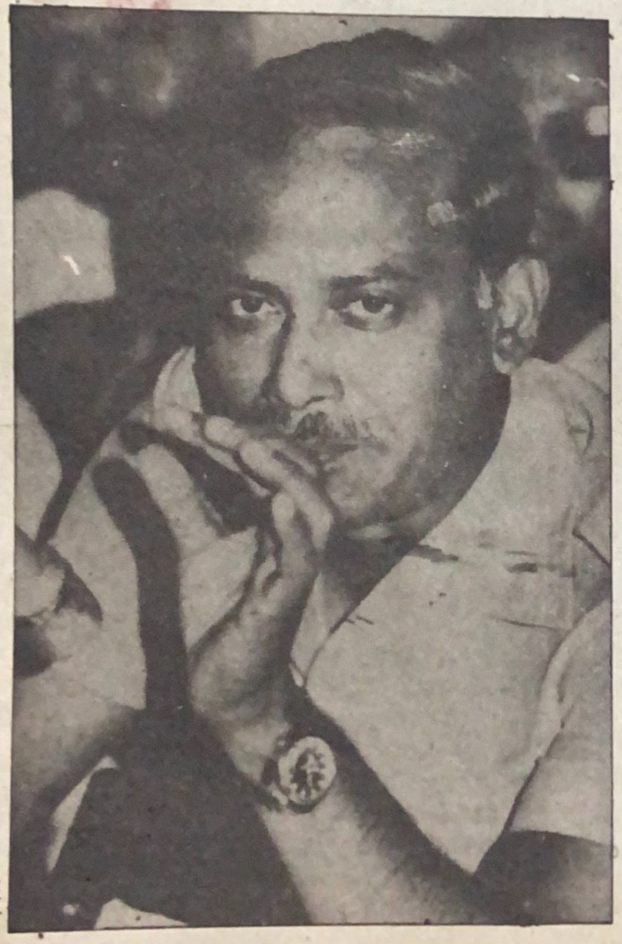

মৃত্যু সংবাদ শুনেই শক্ত মুচ ফওজুল করিম কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন।

এ দৃশ্য দেখার পর তার কথা বলতে ইচ্ছে হয়নি। তবু বলেছি। আমি জানি না কান্না ভেজা চোখের স্মৃতিতে কমলের কোন স্মৃতি তার মনে পড়ছিলো কিনা? তার কিছু মনে পড়ছিলো শাদা পাজামা-পাঞ্জাবী পরা কমলের কথা? যেই কমল ঘুমিয়ে পড়ছিলো চট্টগ্রামের সার্কিট হাউজে! নিদ্রামগ্ন একজন মানুষকে ঝাঝরা করে ফেলা হচ্ছে মেশিন গানের গুলিতে। না তার মনে পড়ছিল, হাসিউচ্ছল কমল চট্টগ্রাম থেকে টেলিফোনে স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছেন। স্ত্রীকে বলছেন, আমি কাল ঢাকা আসবো। কে জানে? না মনে পড়ছে লাজুক স্বভাবের কিশোর বেলার কমলকে! তিনি বললেন না কোন কিছুরই কথা।

মৃত্যুর ধারালো খড়গ কার ঘাড়ে কখন বসে যাবে, কে কখন আমরা এক টুকরো নুড়ির মতো তলিয়ে যাবো, আমরা কেউ জানি না। আর জানি না বলেই তো মৃত্যু আমাদের কাছে এতো রহস্যময়। আর রহস্যময় বলেই তো প্রাণপ্রিয় নেতা প্রেসিডেন্ট জিয়ার মৃত্যুর কথা আমরা জানতে পারিনি। ঘাতকের ঝাক ঝাক বুলেট ভেদ করে গিয়েছে তার দেহ। আর মৃত্যু স্পর্শ রেখেছে তার শরীরে। কিন্তু মানুষ মরে না। কমলও মরেনি। বেঁচে আছেন কোটি মানুষের স্মৃতি ও ভালবাসায়!

তার ছেলেবেলার কথা বলতে গিয়ে তার চাচাতো ভাই ফওজুল করিম বললেন বয়সে আমার চেয়ে অনেক ছোট কমল। ছোট বেলায় ছিল লাজুক স্বভাবের।

লাজুক স্বভাবের কমল একদিন রাষ্ট্রনায়ক হবে, একথা ভাবিনি। কিন্তু তার ভেতরে ছিল দেশ সম্পর্কে, দেশের মানুষ সম্পর্কে জানবার আগ্রহ। এর উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি বললেন, আনুমানিক ৫৫ সালের কথা। যুদ্ধের মহড়ার ট্রেনিং চলছে কুমিল্লা সেনানিবাসে। শীতের রাত। যুদ্ধের মহড়া দিতে গিয়ে লুকিয়েছিল এক কৃষকের গোয়াল ঘরে। ভোর হয়ে গেছে। তখন পানি চেয়েছিলো একজন লোকের কাছে। কিন্তু লোকটি জবাব দিয়েছিল উর্দুতে। তাই আর কমল পানি খায়নি।

তিনি আরো বললেন, শেখ মুজিবের শাসন আমলে যখন জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে হৈ-হৈ করে। কমল এ নিয়ে খুব চিন্তা ভাবনা করছে। তখন আমি বললাম, তোমাকে ক্ষমতা দিলে সব ঠিকঠাক করতে পারবে? কমল বলেছিলো-পারবো। তখনও বুঝতে পারিনি সত্যি তার ক্ষমতা ছিল।

তিনি কমলের আর একটি স্বভাবের কথা বললেন। বললেন, কমল সিগারেট খেতো না। তবে খুব টেনশনে থাকলে সিগারেট

খেতো। ছোট্ট একটি টেবিল দেখিয়ে তিনি বললেন, এই টেবিলে বসে মাঝে-মধ্যে সিগারেট চেয়েছে, খেয়েছে। তখনই বুঝেছি, কমল টেনশনে আছে।

জিয়ার ডাক নাম ছিল কমল।

কমলরা পাঁচ ভাই। বোন নেই। কমল দ্বিতীয়। বড় ভাই রেজাউর রহমান ইঞ্জিনিয়ার। জাম্বিয়ায় চাকরি করেন। তৃতীয় ভাই মিজানুর রহমান বিসিসিআই-এর লন্ডন ব্রাঞ্চে চাকরি করেন। ৪র্থ ভাই খলিলুর রহমান। ফার্মাসিস্ট। যুক্তরাষ্ট্রে চাকরিরত। ছোট ভাই আহমেদ কামাল, ঢাকাতে পর্যটনে চাকরিরত।

ছোটবেলা কেটেছে কলকাতায়। ১৯৪৭ সালে করাচীতে চলে যান তাঁর বাবা। সেখানেই কেটেছে তাঁর স্কুল ও কলেজ জীবন। সেখান থেকেই তিনি সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। তখন মাঝে মধ্যে আসতেন ঢাকাতে। উঠতেন আত্মীয়-স্বজনের বাসায়।

মাঝে-মধ্যে ছোট চাচার বাসায়ও উঠতেন। তার ছোট চাচী শামসুন্নাহার বেগম বললেন, আমার বছর দুয়েকের ছোট ছিল কমল। তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা ৫৪ সালে। তখন মাঝে-মধ্যে বেড়াতে আসতেন আমাদের বাসায়। কম কথা বলতেন। তখন ছিল কিছুটা লাজুক স্বভাবের। ৬৫ সালের দিকে এসে তাঁর স্বভাবে পরিবর্তন আসে। কিছুটা গম্ভীর হয়।

তিনি বললেন, ৬৫ সালের যুদ্ধের কথা কমল প্রায় বলতো। আমরা রহস্য করে তখন বলতাম, এতো যুদ্ধ করেছ। অথচ কাগজে-পত্রে তো তোমার ছবি দেখি না। হাসতে হাসতে জবাব দিতো কমল, আমি সামনে থেকে যুদ্ধ করেছি। সেখানে কাগজের লোকেরা যেতে সাহস পায় না। ছবি তুলবে কি করে?

ঢাকেশ্বরী কটন মিলসে

তিনি আরো বললেন, তখন তাঁর খুব সিনেমা দেখার সখ ছিল।

৬০ সালে কমল বিয়ে করে পুরানা পল্টনে আমার বাড়িতে ওঠেন। শাহবাগ হোটেলে তখন আমরা তার বিয়ের অভ্যর্থনার আয়োজন করি।

তিনি আরো বললেন, ৫০ সালের কথা। তখন সিরাজুল ইসলাম নামে তাঁর এক আত্মীয় ছিলেন যশোরের এমপি। করাচীতে জাতীয় সংসদে তাঁর কাছ থেকে পাশ নিয়ে প্রায়ই সংসদে যেতো। নেতাদের বক্তব্য শুনতো।

তিনি আরো বললেন, কমলের মা ভালো গান গাইতে জানতেন। করাচী বেতার থেকেও দু'একবার গান গেয়েছিলেন।

৭০ সালে তার বাবা মারা যান। তখন সামান্য অসুস্থ ছিল কমল। কম্বাইন্ড মিলিটারী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলো চিকিৎসার জন্য। আমরা তাঁর বাবার মৃত্যু সংবাদ জানানোর পর কোন কথা বললো না কমল। কাঁদলো না। একদম চুপ হয়ে গেলো। এরপর বহুদিন দেখা হয়নি। ৭১ সালে একটি সবুজ রঙের জীপ তার স্ত্রী ও দুই ছেলেকে দিয়ে যায় আমার পুরানা পল্টনের বাসায়। আর সে সময়ে কমলের সঙ্গে আবার দেখা।

প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর ছিলো ভীষণ ব্যস্ত। দেখা-শোনা কম হয়েছে। কম কথা হয়েছে।

'জীবন বাংলাদেশ আমার মরণ বাংলাদেশ.. .....'

বাংলাদেশ ছিলো তাঁর জীবনে মরণে। তাঁকে চেনে মুক্তিযুদ্ধের উত্তাল দিনের রক্ত অশ্রু বারুদের গর্জনমুখরতা, তাঁকে চেনে কাশাদহ খালে প্রবাহিত কল-কল জলধ্বনি। তাঁর প্রয়াণে তাই জাতীয় ইতিহাসের এক বর্ণাঢ্য, ঘটনাবহুল, সফল ও সম্ভাবনাময় ব্যক্তিত্ব ও জীবনের ওপর নেমে এসেছে অকাল পরিসমাপ্তি। দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণ, দরিদ্র সর্বসাধারণের অর্থনৈতিক মুক্তি, নারীজাগরণ ও শিশুকল্যাণের জন্যে নিরলস কাজ করে যাওয়া, উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশ নিতে গ্রাম-গ্রামান্তরে ছুটে বেড়ানো সেই মানুষটির ছবি কখনো মুছে যাওয়ার নয়। এদেশের প্রতিঘরে ৩০ মে সকাল থেকে তাইতো তিনি স্মৃতিসুবাসিত একটি নাম, স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের জন্যে দৃঢ় এক প্রত্যয়ের নাম। সেই প্রত্যয়দীপ্ত চেতনায় তাঁর উপস্থিতি উজ্জ্বল। বাংলাদেশের গ্রামের পর গ্রাম তিনি হেঁটে চলেন মেঠো পথ ধরে সবুজের প্রান্ত অবধি—মাথায় শোলার টুপি, চোখে রোদচশমা, ঘামে ভেজা গেঞ্জি, হাঁটু পর্যন্ত গোটানো প্যান্ট,—দ্রুত কিন্তু দৃঢ় পদক্ষেপে তিনি এগিয়ে চলেন সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্নের-দিকে......

আমাদের সেই স্বপ্ন-সেই চেতনার গর্বিত সরণী ধ'রে এখনো তিনি হেঁটে হেঁটে চলছেন.....

বিচিত্রা রিপোর্ট

খেতো। ছোট্ট একটি টেবিল দেখিয়ে তিনি বললেন, এই টেবিলে বসে মাঝে-মধ্যে সিগারেট চেয়েছে, খেয়েছে। তখনই বুঝেছি, কমল টেনশনে আছে।

জিয়ার ডাক নাম ছিল কমল।

কমলরা পাঁচ ভাই। বোন নেই। কমল দ্বিতীয়। বড় ভাই রেজাউর রহমান ইঞ্জিনিয়ার। জাম্বিয়ায় চাকরি করেন। তৃতীয় ভাই মিজানুর রহমান বিসিসিআই-এর লন্ডন ব্রাঞ্চে চাকরি করেন। ৪র্থ ভাই খলিলুর রহমান। ফার্মাসিস্ট। যুক্তরাষ্ট্রে চাকরিরত। ছোট ভাই আহমেদ কামাল, ঢাকাতে পর্যটনে চাকরিরত।

ছোটবেলা কেটেছে কলকাতায়। ১৯৪৭ সালে করাচীতে চলে যান তাঁর বাবা। সেখানেই কেটেছে তাঁর স্কুল ও কলেজ জীবন। সেখান থেকেই তিনি সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। তখন মাঝে মাঝে আসতেন ঢাকাতে। উঠতেন আত্মীয়-স্বজনের বাসায়।

মাঝে-মধ্যে ছোট চাচার বাসায়ও উঠতেন। তার ছোট চাচী শামসুন্নাহার বেগম বললেন, আমার বছর দুয়েকের ছোট ছিল কমল। তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা ৫৪ সালে। তখন মাঝে-মধ্যে বেড়াতে আসতেন আমাদের বাসায়। কম কথা বলতেন। তখন ছিল কিছুটা লাজুক স্বভাবের। ৬৫ সালের দিকে এসে তাঁর স্বভাবে পরিবর্তন আসে। কিছুটা গম্ভীর হয়।

তিনি বললেন, ৬৫ সালের যুদ্ধের কথা কমল প্রায় বলতো। আমরা রহস্য করে তখন বলতাম, এতো যুদ্ধ করলে। অথচ কাগজে-পত্রে তো তোমার ছবি দেখি না। হাসতে হাসতে জবাব দিতো কমল, আমি সামনে থেকে যুদ্ধ করেছি। সেখানে কাগজের লোকেরা যেতে সাহস পায় না। ছবি তুলবে কি করে?

ঢাকেশ্বরী কটন মিলসে

তিনি আরো বললেন, তখন তাঁর খুব সিনেমা দেখার শখ ছিল।

৬০ সালে কমল বিয়ে করে পুরানা পল্টনে আমার বাড়িতে ওঠেন। শাহবাগ হোটেলে তখন আমরা তার বিয়ের অভ্যর্থনার আয়োজন করি।

তিনি আরো বললেন, ৫০ সালের কথা। তখন সিরাজুল ইসলাম নামে তাঁর এক আত্মীয় ছিলেন যশোরের এমপি। করাচীতে জাতীয় সংসদে তাঁর কাছ থেকে পাশ নিয়ে প্রায়ই সংসদে যেতো। নেতাদের বক্তব্য শুনতো।

তিনি আরো বললেন, কমলের মা ভালো গান গাইতে জানতেন। করাচী বেতার থেকেও দু'একবার গান গেয়েছিলেন।

৭০ সালে তার বাবা মারা যান। তখন সামান্য অসুস্থ ছিল কমল। কম্বাইন্ড মিলিটারী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলো চিকিৎসার জন্য। আমরা তাঁর বাবার মৃত্যু সংবাদ জানানোর পর কোন কথা বললো না কমল। কাঁদলো না। একদম চুপ হয়ে গেলো। এরপর বহুদিন দেখা হয়নি। ৭১ সালে একটি সবুজ রঙের জীপ তার স্ত্রী ও দুই ছেলেকে দিয়ে যায় আমার পুরানা পল্টনের বাসায়। আর সে সময়ে কমলের সঙ্গে আবার দেখা।

প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর ছিলো ভীষণ ব্যস্ত। দেখা-শোনা কম হয়েছে। কম কথা হয়েছে।

'জীবন বাংলাদেশ আমার মরণ বাংলাদেশ.. ......'

বাংলাদেশ ছিলো তাঁর জীবনে মরণে। তাঁকে চেনে মুক্তিযুদ্ধের উত্তাল দিনের রক্ত অশ্রু বারুদের গর্জনমুখরতা, তাঁকে চেনে কাশাদহ খালে প্রবাহিত কল-কল জলধ্বনি। তাঁর প্রয়াণে তাই জাতীয় ইতিহাসের এক বর্ণাঢ্য, ঘটনাবহুল, সফল ও সম্ভাবনাময় ব্যক্তিত্ব ও জীবনের ওপর নেমে এসেছে অকাল পরিসমাপ্তি। দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণ, দরিদ্র সর্বসাধারণের অর্থনৈতিক মুক্তি, নারী-জাগরণ ও শিশুকল্যাণের জন্যে নিরলস কাজ করে যাওয়া, উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশ নিতে গ্রাম-গ্রামান্তরে ছুটে বেড়ানো সেই মানুষটির ছবি কখনো মুছে যাওয়ার নয়। এদেশের প্রতিঘরে ৩০ মে সকাল থেকে তাইতো তিনি স্মৃতিসুবাসিত একটি নাম, স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের জন্যে দৃঢ় এক প্রত্যয়ের নাম। সেই প্রত্যয়দীপ্ত চেতনায় তাঁর উপস্থিতি উজ্জ্বল। বাংলাদেশের গ্রামের পর গ্রাম তিনি হেঁটে চলেন মেঠো পথ ধরে সবুজের প্রান্ত অবধি—মাথায় শোলার টুপি, চোখে রোদচশমা, ঘামে ভেজা গেঞ্জি, হাঁটু পর্যন্ত গোটানো প্যান্ট,—দ্রুত কিন্তু দৃঢ় পদক্ষেপে তিনি এগিয়ে চলেন সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্নের-দিকে......

আমাদের সেই স্বপ্ন-সেই চেতনার গর্বিত সরণী ধ'রে এখনো তিনি হেঁটে হেঁটে চলছেন......

বিচিত্রা রিপোর্ট

একটি জাতির জন্ম

মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান

'মুক্তিযুদ্ধের বিখ্যাত ত্রয়ী ও তাঁদের স্মৃতিকথা' শিরোনামে 'বিচিত্রা' প্রচ্ছদকাহিনী প্রকাশ করেছিলো ১৯৭৪ সালের স্বাধীনতা দিবস সংখ্যায়। এতে স্মৃতিকথা লিখেছিলেন মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ও মেজর জেনারেল শফিউল্লাহ। প্রাসঙ্গিক সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হয়েছিলো : 'মুক্তিযুদ্ধের সময় এই তিনজনের নাম লোকের মুখে-মুখে গল্পের মতো ফিরতো, যুদ্ধের সময় এঁদের নাম লোকের বুকের বল বাড়িয়ে দিতো। এঁরা যুদ্ধ করতেন বীরত্বের সঙ্গে সজীব রাখতেন স্বাধীনতার প্রতিজ্ঞা।' এখানে সেই স্মৃতিকথাটির অংশবিশেষ পুনর্মুদ্রিত করা হলো। এটিই প্রেসিডেন্ট জিয়ার একমাত্র প্রকাশিত রচনা।

পাকিস্তানী বাহিনীর আত্মসমর্পণের সপ্তাহ খানেক পরে একজন সাংবাদিক আমাকে বলেছিলেন, সেই দুঃস্বপ্নে ভরা দিনগুলো সম্পর্কে কিছু স্মৃতিকথা লিখতে। আমি একজন সৈনিক আর লেখা একটি ঈশ্বর প্রদত্ত শিল্প। সৈনিকরা স্বভাবতই সেই বিরল শিল্পক্ষমতার অধিকারী হয় না। কিন্তু সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তটি ছিল এমনই আবেগধর্মী যে আমাকেও তখন কিছু লিখতে হয়েছিল। কলম তুলে নিতে হয়েছিল হাতে।

ভারত ভেঙ্গে দু-ভাগ হয়ে সৃষ্টি হয়েছিল অস্বাভাবিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের। আর তার অব্যবহিত পরেই আমরা চলে গিয়েছিলাম করাচী। সেখানে ১৯৫২ সালে আমি পাস করি ম্যাট্রিক। যোগদান করি পাকিস্তান সামরিক একাডেমীতে। অফিসার ক্যাডেট রূপে। সেই থেকে অধিকাংশ সময়ই বিভিন্ন স্থানে আমি কাজ করেছি পাকিস্তানী বাহিনীতে।

স্কুল জীবন থেকেই পাকিস্তানীদের দৃষ্টিভঙ্গীর অস্বচ্ছতা আমার মনকে পীড়া দিতো। আমি জা[illegible]ন, অন্তর দিয়ে ওরা আমাদের ঘৃণা করে। স্কুল জীবনেই বহু[illegible] শুনেছি আমার স্কুল বন্ধুদের আলোচনা। তাদের অভিভাবকরা বাড়িতে যা বলতো তাই তারা রোমন্থন করতো স্কুল প্রাঙ্গনে। আমি শুনতাম মাঝে মাঝেই শুনতাম তাদের আলোচনার প্রধান বিষয় হতো বাংলাদেশ আর বাংলাদেশকে শোষণ করার বিষয়। পাকিস্তানী তরুণ সমাজকেই শেখানো হতো বাঙালীদের ঘৃণা করতে। বাঙালীদের বিরুদ্ধে একটা ঘৃণার বীজ উপ্ত করে দেওয়া হতো স্কুল ছাত্রদের শিশু মনেই। শিক্ষা দেয়া হতো তাদের—বাঙালীকে

বড় ছেলে তারেক রহমান ও বেগম জিয়ার সঙ্গে, '৭০

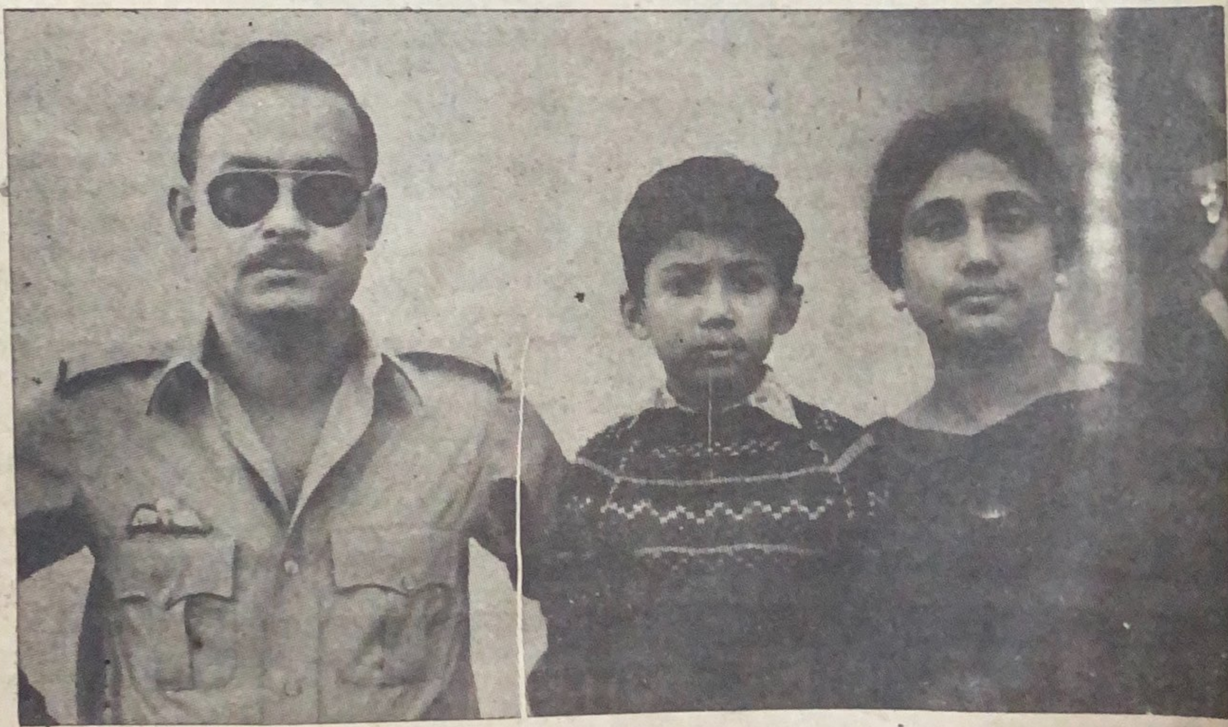

নিকৃষ্টতর মানব জাতিরূপে বিবেচনা করতে। অনেক সময়ই আমি থাকতাম নীরব শ্রোতা। আবার মাঝে মধ্যে প্রত্যাঘাত হানতাম আমিও। সেই স্কুল জীবন থেকেই মনে মনে আমার একটা আকাঙ্ক্ষাই লালিত হতো, যদি কখনো দিন আসে, তাহলে এই পাকিস্তানবাদের অস্তিত্বেই আমি আঘাত হানবো। সযত্নে এই ভাবনাটাকে আমি লালন করতাম। আমি বড় হলাম। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার সেই কিশোর মনের ভাবনাটাও পরিণত হলো। জোরদার হলো। পাকিস্তানী পশুদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরার দুর্বারতম আকাঙ্ক্ষা দুর্বার হয়ে উঠতো মাঝে মাঝেই। উদগ্র কামনা জাগতো পাকিস্তানের ভিত্তি ভূমিটাকে তছনছ করে দিতে। কিন্তু উপযুক্ত সময় আর উপযুক্ত স্থানের অপেক্ষায় দমন করতাম সেই আকাঙ্ক্ষাকে।

বাঙালী অফিসার ও সৈনিকরা সব সময়ই পরিণত হতো পাকিস্তানী অফিসারদের রাজনৈতিক শিকারে। সব বড় বড় পদগুলো আর লোভনীয় নিয়োগপত্রের শিকাগুলো বরাবরই ছিঁড়তো পাকিস্তানীদের ভাগ্যে। বিদেশে শিক্ষার জন্য পাঠানো হতো না বাঙালী অফিসারদের। আমাদের বলা হতো ভীরু কাপুরুষ। আমাদের নাকি ক্ষমতাই নেই ভালো সৈনিক হওয়ার। ঐতিহ্য নেই যুদ্ধের সংগ্রামের।

এরপর এলো আইয়ুবী দশক। আইয়ুব খানের নেতৃত্বে চালিত এক প্রতারণাপূর্ণ সামরিক শাসনের কালো দশক। এই তথাকথিত উন্নয়ন দশকে সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল বাঙালী সংস্কৃতিকে বিকৃত করার। আমাদের জাতীয়তা খাটো করার। বাংলাদেশের বীর জনতা অবশ্য বীরত্বের সঙ্গে প্রতিহত করেছে এই হীন প্রচেষ্টা। এ ছিল এক পালা বদলের কাল। এখান থেকেই আমাদের ভাষা সাহিত্য ও শিল্প গ্রহণ করেছে এক নতুন পথঃ আমাদের বুদ্ধিজীবীমহল, ছাত্র-জনতা আর প্রচার মাধ্যমগুলো সাংস্কৃতিক বন্ধনকে দৃঢ় করার জন্য পালন করেছে এক বিরাট ভূমিকা। আমাদের দেশের বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য আসন্ন সশস্ত্র সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুতিতে জনগণ ও সৈনিকদের মনোভাবকে গড়ে তোলা আর আন্দোলনে দ্রুততর গতি সঞ্চারণে এঁদের রয়েছে এক বিরাট অবদান। জাতীয়তাবাদ গড়ে তোলার একমাত্র উপাদান হচেছ এর সংস্কৃতি।

১৯৬৩ সনে আমি ছিলাম সামরিক গোয়েন্দা বিভাগে। সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের তদানিন্তন পরিচালক মেজর জেনারেল নওয়াজেশ আলী মালিক এক সময় আমার এলাকা পরিদর্শন করেন। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হচিছল একদিন। বাংলাদেশের অর্থনীতিকে কিছুটা উন্নততর করবার সরকারী অভীপ্সা সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করছিলেন তিনি। এক পর্যায়ে এ ব্যাপারে তিনি আমার অভিমত জানতে চাইলে আমি বললাম, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যদি ব্যাপক অগ্রগতি সাধন করা না হয়, তাহলে দেশে প্রশাসক ব্যবস্থা চালু রাখা সরকারের পক্ষে কঠিন হবে। এর জবাবে তিনি বললেন, বাংলাদেশ যদি স্বয়ম্ভর হয় তাহলে সে আলাদা হয়ে যাবে। পাকিস্তানের শীর্ষ স্থানীয় সামরিক কর্তাদের বাংলাদেশ সম্পর্কে এটাই ছিল মনোভাব। অথচ তারাই তখন দেশটা শাসন করছিলেন। তারা চাচিছলেন বাংলাদেশটাকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দেউলিয়া করে রাখতে।

১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হচেছ আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। সে সময়ে আমি ছিলাম পাকিস্তানী সেনা বাহিনী যার নামে গর্ববোধ করতো তেমনি একটা ব্যাটেলিয়ানের কোম্পানী কমান্ডার। সেই ব্যাটেলিয়ান এখন বাংলাদেশ সেনা বাহিনীরও গর্বের বস্তু। খেমখারান রণাঙ্গনের বেদিয়ানে তখন আমরা যুদ্ধ করেছিলাম। সেখানে আমাদের ব্যাটেলিয়ান বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। এই ব্যাটেলিয়ানই লাভ করেছিল পাক-বাহিনীর মধ্যে দ্বিতীয় সর্বাধিক বীরত্ব পদক। ব্যাটেলিয়ানের পুরস্কার বিজয় কোম্পানী ছিল আমার কোম্পানী আলফা কোম্পানী। এই কোম্পানী যুদ্ধ করেছিল ভারতীয় সপ্তদশ রাজপুত উনবিংশ মারাঠা লাইট ইনফ্যান্ট্রি ষোড়শ পাঞ্জাব ও সপ্তম লাইট ক্যাভালরীর (সাঁজোয়া বহর) বিরুদ্ধে। এই কোম্পানীর জওয়ানরা এককভাবে এবং সম্মিলিতভাবে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, ঘায়েল করেছে প্রতিপক্ষকে। বহু সংখ্যক প্রতিপক্ষকে হতাহত করে, যুদ্ধবন্দী হিসেবে আটক করে এই কোম্পানী অর্জন করেছিল সৈনিক সুলভ মর্যাদা, প্রশংসা করেছিল তাদেরও প্রীতি। যুদ্ধবিরতির সময় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সুযোগে আমি দেখা করেছিলাম বেশ কিছু সংখ্যক ভারতীয় অফিসার ও সৈনিকের সঙ্গে। আমি তখন তাদের সঙ্গে কোলাকুলি করেছি হাত মিলিয়েছি। আমার ভালো লাগতো তাদের সঙ্গে হাত মেলাতে। কেননা আমি তখন দেখেছিলাম, তারাও অত্যন্ত উঁচুমানের সৈনিক। আমরা তখন মত বিনিময় করেছিলাম। সৈনিক হিসেবেই আমাদের মাঝে একটা হৃদ্যতাও গড়ে উঠেছিল, আমরা বন্ধুতে পরিণত হয়েছিলাম। এই প্রীতিই দীর্ঘদিন পর বাংলাদেশে হানাদার পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে পাশাপাশি ভাই-এর মত দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করতে উদ্বুদ্ধ করেছে আমাদের।

পাকিস্তানীরা ভাবতো বাঙালীরা ভালো সৈনিক নয়। খেমখারানের যুদ্ধে তাদের এই বদ্ধমূল ধারণা ভেঙ্গে চুর্ণবিচুর্ণ হয়ে গেছে। পাকিস্তানী বাহিনীর সবার কাছেই আমরা ছিলাম তখন ঈর্ষার পাত্র। সে যুদ্ধে এমন একটা ঘটনাও ঘটেনি যেখানে বাঙালী জওয়ানরা প্রাণের ভয়ে পালিয়ে গেছে। ভারতের সঙ্গে সেই সংঘর্ষে বহু ক্ষেত্রে পাকিস্তানীরাই বরং লেজ গুটিয়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বেঁচেছে। সে সময় পাকিস্তানীদের সমম্বয়ে গঠিত পাক বাহিনীর এক প্রথম শ্রেণীর সাঁজোয়া ডিভিশনই নিম্নমানের ট্যাঙ্কের অধিকারী ভারতীয় বাহিনীর হাতে নাস্তানাবুদ হয়েছিল, এসব কিছুতে পাকিস্তানীরা বিচলিত হয়ে পড়েছিল। বাঙালী সৈনিকদের ক্ষমতা উপলব্ধি করে হৃদকম্প জেগে ছিল তাদের।

এই যুদ্ধে পাকিস্তান বিমান বাহিনীর বাঙালী পাইলটরাও অর্জন করেছিল প্রচুর সুনাম। এসব কিছুই চোখ খুলে দিয়েছিল বাঙালী জনগণের। তারাও আস্থাশীল হয়ে উঠেছিল তাদের বাঙালী সৈনিকদের বীরত্বের প্রতি। বাঙালী সৈনিকের বীরত্ব ও দক্ষতার প্রশংসা হয়েছিল তখন বিশ্বের বিভিন্ন সংবাদপত্রে। উল্লেখ করা হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের নাম। এ নাম আজ বাংলাদেশেরও এক পরম প্রিয় সম্পদ।

এসব কিছুর পরিণতিতে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বাহিনী গ্রহণ করলো এক গোপন পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা ঠিক করলো প্রতিরক্ষা বাহিনীতে বাঙালীদের আনুপাতিক হার কমাতে হবে। তারা তাদের এই গোপন পরিকল্পনা পুরোপুরিভাবে কার্যকরী করলো। কিন্তু এই গোপন তথ্য আমাদের কাছে গোপন ছিল না।

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ আত্মবিশ্বাস জাগিয়েছিল আমাদের মনে। বাঙালী সৈনিকদের মনে। বিমান বাহিনীর বাঙালী জওয়ানদের মনে। আমরা তখনই বুঝেছিলাম, বিশ্বের যে কোন বাহিনীর মোকাবিলায়ই আমরা সক্ষম।

'জেড' ফোর্সের অধিনায়ক

জানুয়ারী মাসে আমি নিযুক্ত হয়েছিলাম পাকিস্তান সামরিক একডেমীতে প্রশিক্ষকের পদে। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি একদিন শিক্ষক হলাম। মনে রইলো শুধু যুদ্ধের স্মৃতি। সামরিক একাডেমীতে শুরু হলো আমার শিক্ষক জীবন। পাকিস্তানীদের আমি সমর বিদ্যায় পারদর্শী করে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করলাম। আর সেই বর্বররা

এই বিদ্যাকে কাজে লাগালো আমারই দেশের নিরস্ত্র জনতার বিরুদ্ধে এক পাশবিক যুদ্ধ ঘোষণা করে দিয়ে।

সামরিক একাডেমীতে থাকাকালেও আমি সম্মুখীন হয়েছি শুধু নিকৃষ্ট অভিজ্ঞতার। সেখানে দেখেছি বাঙালী ক্যাডেটদের প্রতি পাকিস্তানীদের একই অজ্ঞতার ঐতিহ্যবাহী প্রতিচ্ছবি। অবৈধ উপায়ে পাকিস্তানীদের দেখেছি বাঙালী ক্যাডেটদের কোণঠাসা করতে। আমরা যখন ছাত্র ছিলাম তখন যেমন আমি যখন শিক্ষক হলাম তখনো তেমনিভাবেই বাঙালী ক্যাডেটদের ভাগ্যে জুটতো শুধু অবহেলা অবজ্ঞা আর ঘৃণা। আন্তঃসার্ভিস নির্বাচনী বোর্ডে গ্রহণ করা হতো নিম্নমানের বাঙালী ছেলেদের। ভালো ছেলেদের নেওয়া হতো না ক্যাডেট-রূপে। রাজনৈতিক মতাদর্শ আর দরিদ্র পরিবারের নামে প্রত্যাখ্যান করা হতো তাদের। এর সবকিছুই আমাকে ব্যথিত করতো। এই সামরিক একাডেমীতেই পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে আমার মন বিদ্রোহ করলো। একাডেমীর গ্রন্থাগারে সংগৃহিত ছিল সব বিষয়ের ভালো ভালো বই। আমি জ্ঞানার্জনের এই সুযোগ গ্রহণ করলাম। আমি ব্যাপক পড়াশুনা করলাম ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে বৃটিশ ঐতিহাসিকরা এটাকে আখ্যায়িত করেছিল বিদ্রোহ হিসেবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা বিদ্রোহ ছিল না; এটা ছিল এক মুক্তিযুদ্ধ। ভারতের জন্যে স্বাধীনতার যুদ্ধ।

পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর তথা কথিত সামরিক যুদ্ধজীবীদের সাথেও মাঝে মাঝে আমার আলোচনা হতো। তাদের পরিকল্পনা ছিল আরো কয়েক দশক কোটি কোটি জাগ্রত বাঙালীকে দাবিয়ে রাখার। কিন্তু আমি বিশ্বাস করলাম, বাংলাদেশের জনগণ আর ঘুমিয়ে নেই। তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচারের পরিণতিই ছিল এর জ্বলন্ত প্রমাণ। স্বাধীনতার জন্য আমাদের সশস্ত্র সংগ্রামের দিকে এটাও ছিল একটা সুস্পষ্ট অঙ্গুলি সংকেত। এই মামলার পরিণতি এক করে দিল বাঙালী সৈনিক, নাবিক ও বৈমানিকদের। বাংলাদেশের জনগণের সাথে একাত্ম হয়ে গেল তারা। তাদের ওপর পাকিস্তান সরকারের চাপিয়ে দেওয়া সব বিধিনিষেধ ঝেড়ে ফেলা হলো। এক কণ্ঠে সোচ্চার হলো তারা মাতৃভূমির স্বাধীনতার দাবীতে। ইসলামাবাদের যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা এবং অস্ত্র তুলে নেওয়ার মধ্যেই যে আমাদের দেশের—বাংলাদেশের কল্যাণ নিহিত তাতে আর কোন সন্দেহই ছিল না আমাদের মনে। এটাও আমাদের সশস্ত্র সংগ্রামের আরেক দিক দর্শক। এ সময় থেকেই এ ব্যাপারে আমরা মোটামুটিভাবে খোলাখুলি আলোচনাও শুরু করেছিলাম।

১৯৬৯ সালের এপ্রিল মাসে আমাকে নিয়োগ করা হলো জয়দেবপুরে। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের দ্বিতীয় ব্যাটেলিয়নে আমি ছিলাম সেখানে সেকেন্ড ইন-কমান্ড। আমাদের কমান্ডিং অফিসার লেঃ কর্ণেল আবদুল কাইয়ুম ছিল একজন পাকিস্তানী। একদিন ময়মনসিংহের এক ভোজসভায় ধমকের সুরে সে ঘোষণা করলো, বাংলাদেশের জনগণ যদি সদাচরণ না করে তাহলে সামরিক আইনের সত্যিকার ও নির্মম বিকাশ এখানে ঘটানো হবে। আর তাতে হবে প্রচুর রক্তপাত। এই ভোজসভায়

কয়েকজন বেসামরিক ভদ্রলোকও উপস্থিত ছিলেন। তাদের মাঝে ছিলেন ময়মনসিংহের তদানিন্তন ডেপুটি কমিশনার জনাব মোকাম্মেল। লেফটেন্যান্ট কর্নেল কাইয়ুমের এই দাম্ভিকতা আমাদের বিস্মিত করলো। এর আগে কাইয়ুম এক গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিল। ইসলামাবাদে পাকিস্তানী নীতি নির্ধারকদের সাথে সংযোগ ছিল তাঁর। তার মুখে তার পুরনো প্রভুদের মনের কথাই ভাষা পেয়েছে কিন্তু তাই আমি ভাবছিলাম। পরবর্তী সময়ে এ ব্যাপারে আমি তাকে অনেকগুলো প্রশ্ন করি। এবং এর কথা থেকে আমার কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে সে যা বলেছে তা জেনেশুনেই বলেছে। উপযুক্ত সময়ে কার্যকরী করার জন্য সামরিক ব্যবস্থার এক পরিকল্পনা তৈরি করাহয়েছে। আর কাইয়ুম সে সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। আমি এতে আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়ি। এই সময়ে আমি একদিন চতুর্দশ ডিভিশনের সদর দফতরে যাই। জিএসও-১ (গোয়েন্দা) লেঃ কর্নেল তাজ আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের কয়েকজন সম্পর্কে আমার কাছে অনেক কিছু জানতে চায়। আমি তার এসব তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্য কি জিজ্ঞাসা করি। সে আমাকে জানায় যে তারা বাঙালী নেতাদের জীবনী সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করছে। আমি বারবার তাঁকে জিজ্ঞেস করি—এসব খুটিনাটির প্রয়োজন কি? এই প্রশ্নের জবাবে সে জানায়—ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক গতিধারায় এগুলো কাজে লাগবে।

গতিক যে বেশি সুবিধার নয়, তার সাথে আলোচনা করেই আমি তা বুঝতে পারি। সেই বছরেরই সেপ্টেম্বর মাসে চার মাসের জন্য আমি পশ্চিম জার্মানী যাই। এই সময়ে বাংলাদেশের সর্বত্র এক রাজনৈতিক বিক্ষোভের ঝড় বয়ে যায়।

এরপর আমি বাংলাদেশে ফিরে এলাম। ১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বরে আমাকে নিয়োগ করা হলো চট্টগ্রামে। এবার ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অস্টম ব্যাটেলিয়নের সেকেন্ড ইন-কমান্ড। এর কয়েক দিন পর আমাকে ঢাকা যেতে হয়। নির্বাচনের সময়টায় আমি ছিলাম ক্যান্টনমেন্টে। প্রথম থেকেই পাকিস্তানী, অফিসাররা মনে করতো চূড়ান্ত বিজয় তাদেরই হবে। কিন্তু নির্বাচনের দ্বিতীয় দিনেই তাদের মুখে আমি দেখলাম হতাশার সুস্পষ্ট ছাপ। ঢাকায় অবস্থানকারী পাকিস্তানী সিনিয়র অফিসারদের মুখে দেখলাম আমি আতংকের ছবি। তাদের এই আতংকের কারণও আমার অজানা ছিল না। শীঘ্রই জনগণ গণতন্ত্র ফিরে পাবে, এই আশায় আমরা—বাঙালী অফিসাররা—তখন —আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলাম।

চট্টগ্রামে আমরা ব্যস্ত ছিলাম অষ্টম ব্যাটেলিয়ানকে গড়ে তোলার কাজে। এটা ছিল রেজিমেন্টের তরুণতম ব্যাটেলিয়ন। এটার ঘাঁটি ছিল ষোলশহর বাজারে। ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে এই ব্যাটেলিয়নকে পাকিস্তানের খারিয়ানে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। এর জন্য আমাদের সেখানে পাঠাতে হয়েছিল দুশ জওয়ানের এক দ্রুতগামী দল। অন্যরা ছিল একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ের সৈনিক। আমাদের তখন যে সব অস্ত্রশস্ত্র দেওয়া হয়েছিল তারমধ্যে ছিল তিনশ পুরনো ০০৩-রাইফেল চারটা এলএমজি ও দুটি তিন ইঞ্চি মর্টার। গোলাবারুদের পরিমাণও ছিল নগণ্য। আমাদের এন্টিট্যাংক বা ভারী মেশিনগান ছিল না।

ফেব্রুয়ারীর শেষ দিকে বাংলাদেশে যখন রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিস্ফোরণোন্মুখ হয়ে উঠছিল তখন আমি একদিন খবর পেলাম তৃতীয় কমান্ডো ব্যাটেলিয়নের সৈনিকরা চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন এলাকায় ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বিহারীদের বাড়িতে বাস করতে শুরু করেছে। খবর নিয়ে আমি আরো জানলাম, কমান্ডোরা বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র আর গোলাবারুদ নিয়ে বিহারী বাড়িগুলোতে জমা করেছে এবং রাতের অন্ধকারে বিপুল সংখ্যায় তরুণ বিহারীদের সামরিক ট্রেনিং দিচ্ছে এসব কিছু থেকে—এরা যে ভয়ানক রকমের অশুভ একটা কিছু করবে তার সুস্পষ্ট আভাসই আমরা পেলাম।

তারপর এলো ১ মার্চ। এই সময়ে আমার ব্যাটেলিয়নের এনসিওরা আমাকে জানালো প্রতিদিন সন্ধ্যায় বিংশতিতম বালুচ রেজিমেন্টের জওয়ানরা বেসামরিক পোশাক পরে বেসামরিক ট্রাকে করে কোথায় যেন যায়। তারা ফিরে আসে আবার শেষ রাতের দিকে। আমি উৎসুক হলাম। লোক লাগালাম খবর নিতে। খবর নিয়ে জানলাম প্রতি রাতেই তারা যায় কতকগুলো নির্দিষ্ট বাঙালী পাড়ায় নির্বিচারে হত্যা করে সেখানে বাঙালীদের। এই সময় প্রতিদিনই ছুরিকাহত বাঙালীকে হাসপাতালে ভর্তি হতেও শোনা যায়।

এই সময়ে আমাদের কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল জানজুয়া আমার গতিবিধির ওপর লক্ষ্য রাখার জন্যেও লোক লাগায়। মাঝে মাঝেই তার লোকেরা যেয়ে আমার সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে শুরু করে। আমরা তখন আশংকা করছিলাম, আমাদের হয়ত নিরস্ত্র করা হবে। আমি আমার মনোভাব দমন করে কাজ করে যাই এবং তাদের উদ্যোগ ব্যর্থ করে দেয়ার সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা গ্রহণ করি। বাঙালী হত্যা ও বাঙালী দোকানপাটে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ক্রমেই বাড়তে থাকে।

আমাদের নিরস্ত্র করার চেষ্টা করা হলে আমি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবো কর্নেল (তখন মেজর) শওকতও আমার কাছে তা জানতে চান। ক্যাপ্টেন শমসের মবিন এবং মেজর খালেকুজ্জামান আমাকে জানান যে স্বাধীনতার জন্য আমি যদি অস্ত্র তুলে নেই তাহলে তারাও দেশের মুক্তির জন্য প্রাণ দিতে কুণ্ঠাবোধ করবেন না, ক্যাপ্টেন ওলি আহমদ আমাদের মাঝে খবর আদান প্রদান করতেন। জেসিও এবং এনসিওরাও দলে দলে বিভক্ত হয়ে আমার কাছে বিভিন্ন স্থানে জমা হতে থাকলো আসতে থাকে। তারাও আমাকে জানায় যে কিছু একটা না করলে বাঙালী জাতি চিরদিনের জন্যে দাসে পরিণত হবে। আমি নীরবে তাদের কথা শুনতাম। কিন্তু আমি ঠিক করেছিলাম উপযুক্ত সময় এলেই আমি মুখ খুলবো। সম্ভবতঃ ৪ মার্চে আমি ক্যাপ্টেন ওলি আহম্মদকে ডেকে নেই। আমাদের ছিল সেটা প্রথম বৈঠক। আমি তাঁকে সোজাসুজি বললাম, সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করার সময় দ্রুত এগিয়ে আসছে। আমাদের সব সময় সতর্ক থাকতে হবে। ক্যাপ্টেন আহমদও আমার সাথে একমত হন। আমরা পরিকল্পনা তৈরি করি এবং প্রতিদিনই আলোচনা বৈঠকে মিলিত হতে শুরু করি।

১৭ মার্চ স্টেডিয়ামে লেফটেন্যান্ট কর্নেল এম আর চৌধুরী, আমি ক্যাপ্টেন ওলি আহমদ ও মেজর আমিন চৌধুরী এক গোপন বৈঠকে মিলিত হলাম। এক চূড়ান্ত যুদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণ করলাম। লেঃ কর্নেল চৌধুরীকে অনুরোধ করলাম নেতৃত্ব দিতে।

দু'দিন পর ইপিআর-এর ক্যাপ্টেন (এখন মেজর) রফিক আমার বাসায় গেলেন এবং ইপিআর বাহিনীকে সঙ্গে নেয়ার প্রস্তাব দিলেন। আমরা ইপিআর বাহিনীকে আমাদের পরিকল্পনাভুক্ত করলাম।

এরমধ্যে পাকিস্তানী বাহিনীও সামরিক তৎপরতা শুরু করার চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করলো। ২১ মার্চ জেনারেল আবদুল হামিদ খান গেল চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে। চট্টগ্রামে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের চূড়ান্ত পরি-

কল্পনা প্রণয়নই তার এই সফরের উদ্দেশ্য। সেদিন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সেন্টারের ভোজ সভায় জেনারেল হামিদ ২০তম বালুচ রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফাতমিকে বললো—ফাতমি, সংক্ষেপে ক্ষিপ্রগতিতে আর যত কম সম্ভব লোক ক্ষয় করে কাজ করতে হবে। আমি এই কথাগুলো শুনেছিলাম।

২৪ মার্চ ব্রিগেডিয়ার মজুমদার ঢাকা চলে এলেন। সন্ধ্যায় পাকিস্তানী বাহিনী শক্তি প্রয়োগে চট্টগ্রাম বন্দরে যাওয়ার পথ করে নিল। জাহাজ সোয়াত থেকে অস্ত্র নামানোর জন্যেই বন্দরের দিকে ছিল তাদের এই অভিযান।

পথে জনতার সাথে ঘটলো তাদের কয়েক দফা সংঘর্ষ: এতে আহত হলো বিপুল সংখ্যক বাঙালী। সশস্ত্র সংগ্রাম যে কোন মুহূর্তে শুরু হতে পারে, এ আমরা ধরেই নিয়েছিলাম। মানসিক দিক দিয়ে আমরা ছিলাম প্রস্তুত। পরদিন আমরা পথের ব্যারিকেট অপসারণের কাজে ব্যস্ত ছিলাম।

তারপর এলো সেই কালোরাত। ২৫ ও ২৬ মার্চের মধ্যবর্তী কালো রাত। রাত ১টায় আমার কমান্ডিং অফিসার আমাকে নির্দেশ দিলো নৌবাহিনীর ট্রাকে করে চট্টগ্রাম বন্দরে যেয়ে জেনারেল আনসারীর কাছে রিপোর্ট করতে। আমার সাথে নৌবাহিনীর (পাকিস্তানী) প্রহরী থাকবে তাও জানানো হলো। আমি ইচ্ছা করলে আমার সাথে তিনজন লোক নিয়ে যেতে পারি। তবে আমার সাথে আমারই ব্যাটেলিয়নের একজন পাকিস্তানী অফিসারও থাকবে। অবশ্য কমান্ডিং অফিসারের মতে সে যাবে আমাকে গার্ড দিতেই।

এ আদেশ পালন করা আমার পক্ষে ছিল অসম্ভব। আমি বন্দরে যাচ্ছি কিনা তা দেখার জন্য একজন লোক ছিল! আর বন্দরে শবরীর মত প্রতীক্ষায় ছিল জেনারেল আনসারী। হয়তো বা আমাকে চিরকালের মতোই স্বাগত জানাতে।

আমরা বন্দরের পথে বেরোলাম। আগ্রাবাদে আমাদের থামতে হলো। পথে ছিল ব্যারিকেড। এই সময়ে সেখানে এলো মেজর খালেকুজ্জামান চৌধুরী। ক্যাপ্টেন ওলি আহমদের কাছ থেকে এক বার্তা এসেছে। আমি রাস্তায় হাটছিলাম। খালেক আমাকে একটু দূরে নিয়ে গেল। কানে কানে বললো, 'তারা ক্যান্টনমেন্ট ও শহরে সামরিক তৎপরতা শুরু করেছে। বহু বাঙালীকে ওরা হত্যা করেছে।

এটা ছিল একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণের চূড়ান্ত সময়। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আমি বললাম—আমরা বিদ্রোহ করলাম। তুমি ষোলশহর বাজারে যাও। পাকিস্তানী অফিসারদের গ্রেফতার করো। অলি আহম্মদকে বলো ব্যাটেলিয়ন তৈরি রাখতে আমি আসছি।

আমি নৌবাহিনীর ট্রাকের কাছে ফিরে গেলাম। পাকিস্তানী অফিসার, নৌবাহিনীর চীফ পেটি অফিসার ও ড্রাইভারকে জানালাম যে, আমাদের আর বন্দরে যাওয়ার দরকার নেই।

এতে তাদের মনে কোন প্রতিক্রিয়া হলো না দেখে আমি পাঞ্জাবী ড্রাইভারকে ট্রাক ঘুরাতে বললাম। ভাগ্য ভালো সে আমার আদেশ মানলো। আমরা আবার ফিরে চললাম। ষোলশহর বাজারে পৌঁছেই আমি গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে একটা রাইফেল তুলে নিলাম। পাকিস্তানী অফিসারটির দিকে তাক করে বললাম হাত তোলো। আমি তোমাকে গ্রেফতার করলাম। নৌবাহিনীর লোকরা এতে বিভ্রান্ত হয়ে পড়লো। এই মুহূর্তেই আমি নৌ-

কুমিল্লা, ১৯

স্কাউট জাম্বুরীতে

ইন্দোনেশিয়া সফরকালে ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেণ্ট সুহার্তোর সঙ্গে

বাহিনীর অফিসারের দিকে রাইফেল তাক করলাম। তারা ছিল আটজন। সবাই আমার নির্দেশ মানলো এবং অস্ত্র ফেলে দিল।

আমি কমান্ডিং অফিসারের জীপ নিয়ে তার বাসার দিকে রওয়ানা দিলাম। তার বাসায় পেঁছে হাত রাখলাম কলিং বেলে। কমান্ডিং অফিসার পাজামা পরেই বেরিয়ে এলো। খুলে দিল দরজা। ক্ষিপ্রগতিতে আমি ঘরে ঢুকে পড়লাম এবং গলাশুদ্ধ তার কলার টেনে ধরলাম।

দ্রুতগতিতে আবার দরজা খুলে কর্নেলকে আমি বাইরে টেনে আনলাম। বললাম, বন্দরে পাঠিয়ে আমাকে মারতে চেয়েছিলে? এই আমি তোমাকে গ্রেফতার করলাম। এখন লক্ষ্মী সোনার মতো আমার সঙ্গে এসো।

সে আমার কথা মানলো। আমি তাকে ব্যাটেলিয়নে নিয়ে এলাম। অফিসারদের মেসে যাওয়ার পথে আমি কর্নেল শওকতকে (তখন মেজর) ডাকলাম। তাকে জানালাম—আমরা বিদ্রোহ করেছি। শওকত আমার হাতে হাত মিলালো।

ব্যাটেলিয়নে ফিরে দেখলাম, সমস্ত পাকিস্তানী অফিসারকে বন্দী করে একটা ঘরে রাখা হয়েছে। আমি অফিসে গেলাম। চেষ্টা করলাম লেফটেন্যান্ট কর্নেল এম আর চৌধুরীর সাথে আর মেজর রফিকের সাথে যোগাযোগ করতে। কিন্তু পারলাম না। সব চেষ্টা ব্যর্থ হলো। তারপর রিং করলাম বেসা-

জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট ঘোষণার সাংবাদিক সম্মেলনে

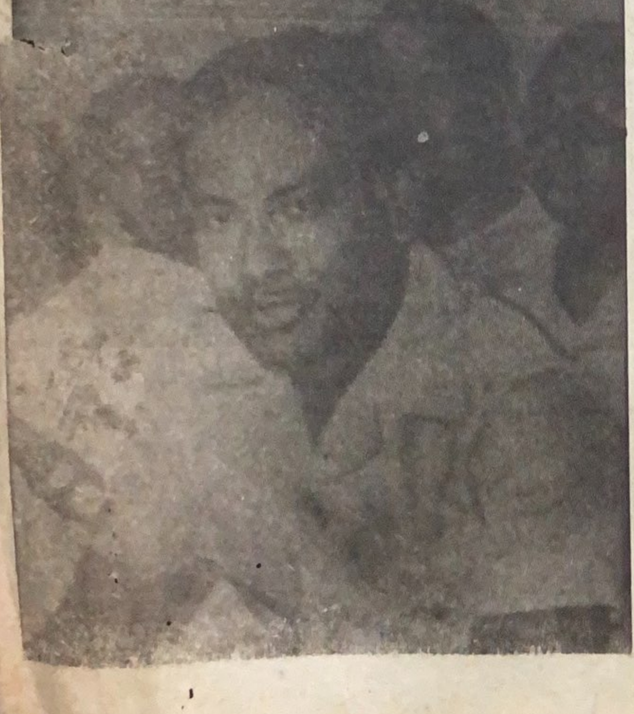

শেষবারের মত শ্রদ্ধা জানাচেছন শোক বিহবল অনুগতরা

গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের কুচকাওয়াজে অভিবাদন গ্রহণ করছেন

মরিক বিভাগের টেলিফোন অপারেটরকে। তাকে অনুরোধ জানালাম—ডেপুটি কমিশনার, পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট কমিশনার, ডিআইজী ও আওয়ামী লীগ নেতাদের জানাতে যে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অষ্টম ব্যাটেলিয়ন বিদ্রোহ করেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করবে তারা।

এ'দের সবার সাথেই আমি টেলিফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি। কিন্তু কাউকেই পাইনি। তাই টেলিফোন অপারেটরের মাধ্যমেই আমি তাঁদের খবর দিতে চেয়েছিলাম। অপারেটর সানন্দে আমার অনুরোধ রক্ষা করতে রাজী হলো।

সময় ছিল অতি মূল্যবান। আমি ব্যাটেলিয়নের অফিসার, জেসিও আর জোয়ানদের ডাকলাম। তাদের উদ্দেশে ভাষণ দিলাম। তারা সবই জানতো। আমি সংক্ষেপে সব বললাম এবং তাদের নির্দেশ দিলাম সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে। তারা সর্বসম্মতিক্রমে হৃষ্টচিত্তে এ আদেশ মেনে নিলো। আমি তাদের একটা সামরিক পরিকল্পনা দিলাম।

তখন রাত ২টা বেজে ১৫ মিনিট। ২৬শে মার্চ। ১৯৭১ সাল। রক্ত আখরে বাঙ্গালীর হৃদয়ে লেখা একটি দিন। বাংলাদেশের জনগণ চিরদিন স্মরণ রাখবে এই দিনটিকে। স্মরণ রাখতে ভালোবাসবে। এই দিনটিকে তারা কোন দিন ভুলবে না। কো-ন দি-ন না।

মৃত্যু সংবাদ শোনার পর মুহূর্তে সংজ্ঞাহীন বেগম জিয়া

স্থিরচিত্র ও একটি হাউই

মইনুল আহসান সাবের

স্কুলের খুব কাছে বাসা। দিব্যি হেঁটে যাওয়া আসা যায়। আজ ক্লাশ ছিলো না। স্কুলের বার্ষিক ফাংশন সামনের সপ্তাহে, সবাই ব্যস্ত। কাজ-কর্ম সবকিছুই অবশ্য গুছিয়ে আনা হয়েছে, এখন ফাইনাল টাচ। এসব ব্যাপারে হেড মাস্টারের নিজেরই খুব উৎসাহ। প্রায় মাস দেড়েক ধরে কী হৈ-হুল্লোড়, আর ছেলে'-রা তো ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ পেয়ে বর্তে গেছে- আহা, এমন ফাংশন বছরে কেন যে দু'টো হয় না !

দায়িত্ব ভাগ-বাটোয়ারা হয়ে গেছে এক মাস আগে। আমার কাজ ছিলো ছেলেদের আবৃত্তি'র রিহার্সেল তদারকি আর স্টেজ ডেকোরেশন। এ আর এমন কি, স্টেজ ডেকোরেশনের নতুন একটা আইডিয়াও মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচেছ। আজ সন্ধ্যের পর ছেলেদের নিয়ে একবার বসবো।

বাসায় ফিরে কিছু করার নেই। মা, মামা-মামী এদের সাথে কতো কথা বলবো ! আমি খাওয়া-দাওয়া সেরে চৌকি'র ওপর পা গুটিয়ে বসে কতোক্ষণ ট্যানজিস্টর শুনলাম। ট্যানজিস্টরটা দিন কয়েক হলো ট্রাবল দিচেছ, কথা পরিষ্কার নয় কেমন ঘড়ঘড়ে আওয়াজ। কিন্তু এদিকে ঠিক করানোর মতো দোকান-টোকানও নেই। টাউনের দিকে না গেলে হচেছ না। আওয়াজটা বড় বাজে, কানে লাগে। ওটা বন্ধ করে দিয়ে পা দোলাতে দোলাতে একটা পান চিবোই। এ অভ্যেস অল্প দিনের। শখ করে খেতে খেতে নেশা হয়ে গেছে।

ভাবলাম চে গুয়েভারা'র জীবনীটা শেষ করি। দিক কয়েক আগে স্কুল লাইব্রেরী থেকে এনেছি। কী বই পুরো কাহিনী-সেতো অদ্ভুত আর বর্ণনাটাও চমৎকার। পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে বেশ ইনসপায়ার্ড হয়ে পড়েছি। কিন্তু বাইরে এমন অলস দুপুর, গাছের পাতাটিও নড়ছে না এ সময় চে'র জীবন কি ভালো লাগবে তার চেয়ে বরং আর্ধেক লেখা কবিতাটা শেষ করি। শেষ পর্যন্ত চেয়ার টেনে ঐ আধ-লেখা কবিতার পেছনেই লেগে গেলাম। আমি কবিতা লিখি মাঝে মাঝে। ঢাকার এক লিটল ম্যাগাজিনে একটা কবিতা পাঠিয়েছিলাম। সেটা দু'লাইন বাদ দিয়ে ছেপেছে। আর দু'টো সাপ্তাহিকে দু'টো কবিতা পড়ে আছে। ছাপবে না বোধ হয় লেখা পাঠানোর ক'মাসের মধ্যে ছাপা না হলে নাকি বুঝে নিতে হবে অমনোনীত। অবশ্য এমনও হতে পারে আমার কবিতা দু'টো পেঁছায়নি, যে ডাক-ব্যবস্থা আমাদের। ডাকে পাঠানোর চেয়ে বরং সম্পাদক'কে সামনা সামনি দেখা দেওয়া ভালো। কিন্তু আমি সেই ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পর থেকে ঢাকা ছাড়া। তা যাক, এ কবিতাটা দেবো টাউনের এক দৈনিক পত্রিকায়। আমার এক ছাত্রের বড় ভাই সে পত্রিকায় কাজ করে, ছাত্র বলেছিলো। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টা করেও কবিতাটা শেষ করতে পারলাম না, জুতসই শব্দ খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তবুও লেগেই থাকবো ভেবেছিলাম, কিন্তু ঢাকা থেকে বাবু'র চিঠি এলো।

বাবু আমার ছোটোবেলার বন্ধু। আমরা তখন থাকতাম শহরে। দু'জন এক স্কুলে পড়তাম, সেই নীচু ক্লাশ থেকে এক-সঙ্গে। ওরা থাকতো আলী আহমেদ রোডে, শহরের অভিজাত এলাকা আমরা তার কিছু দূরে, যদিও এ'দু'এলাকার মধ্যে

পার্থক্য ছিলো বিস্তর। বাড়ির কাজের ছেলের ওপর 'সুটকেসের ভার চাপিয়ে ও স্কুলে আসতো ফিরে যেতো। আর আমাকে অফিসের পথে পৌঁছে দিয়ে যেতেন বাবা। তবু আমাদের বন্ধুত্ব হয়েছিলো। আমি ওর সুন্দর মলাটের বই-খাতা, জলছবি'র বই রঙ পেন্সিল দেখে লোভে পড়িনি। ছেলে বেলায় কিছু কিছু ব্যাপার ঘটে যায়। এই যেমন কারো কারো সাথে চিরদিনের বন্ধুত্ব। বাবু'র সাথে আমার বন্ধুত্ব এরকম। ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে বোঝানোর কিছু নয়, বোঝানো যায় না। সেই ছেলেবেলায় আমার মধ্যে কি আকৃষ্ট করার কিছু ছিলো? বাবু বলতে পারবে আমি কোনদিন জিজ্ঞেস করিনি।

স্কুলের নীচু ক্লাশের দিনগুলোর কথা মনে নেই। সেসব স্পষ্ট মনে থাকে না, দু'একটা স্মৃতি থাকে সজীব বাকীগুলো তালগোল পাকিয়ে যায়। আমরা পাশাপাশি বসতাম, ক্লাশে স্যারের বকুনী খেতাম, টিফিন টাইমে একসংগে ঘুরতাম ক্লাশের অন্যান্য ছেলেরা ক্ষ্যাপাতো—এসব হয়তো কোনো ব্যাপার নয়। আজ বেশ ক'য়েক বছর পরও যে কোনো স্কুলে এ রকম মানিক-জোড় ছেলে খুঁজে পাওয়া যাবে।

আমি সুযোগ পেলেই বাবুদের বাসায় যেতাম। একতলা ফকফকে শাদা বাড়ি। আমার মনে হতো শাদা পরী, কোন সময় যে ডানা মেলে উড়ে চলে যাবে। ওদের বাসায় সবার জিনিশ আলাদা আলাদা। বাবু'র বাবা'র সাথে কখনো কখনো দেখা হতো, কথা হতো আরো কম। কোনোদিন সামনা সামনি পড়ে গেলে গম্ভীর মুখে আগে হোম-টাস্ক শেষ করবে বুঝেছো, তারপর খেলা-ধুলো।' এই পর্যন্তই তারপরই কাগজ-পত্রের মধ্যে মাথা গুঁজতেন, বেরিয়ে য়েতেন কিংবা আশে-পাশে লোক জনের সাথে কথা বলতেন। বাবু'র মা ছিলেন খুব ভালো। সেই ছোট বেলায় মনে হতো আমার নিজের মা'র চেয়েও ভালো। আমাদের সব আবদার ছিলো তার কাছে। একবার আমাকে খুব সুন্দর একটা শার্ট দিয়েছিলেন। সেটা আমার খুব প্রিয় ছিলো দামী কাপড় বুকের ওপর দু'দুটো পাখি ডানা মেলে আছে। এই শার্ট নিয়ে আমার বাবা খুব রাগ করেছিলেন। আমি জেদ ধরে খুব কান্না-কাটি না করলে হয়তো ফিরিয়েই দিয়ে আসতেন।

বাবু অবশ্য আমাদের বাসায় প্রায় আসতোই না। আমি নিজেই বলতাম না। আমাদের ছোটোখাটো টিনের ঘর, গাদা-গাদি করে বাবা-মা, ভাই-বোন সবাই ঘুমোতাম। বাবুদের বাসায় যেমন আলাদা ড্রইংরুম, ডাইনিংস্পেস বেডরুম ভিজিটিং রুম—এসব আমাদের কিছু ছিলো না। আমার লজ্জা লাগতো বৈকি। এখন মনে হয় মধ্যবিত্তের এই নিজেকে লুকানোর মানসিকতা কি খুব ছোটবেলা থেকে গ্রো করে? নইলে, বাবু আমার এতো প্রিয় বন্ধু, ওকে আমাদের বাসায় আসার কথা বলতে লজ্জা পেতাম কেন?

ম্যাট্রিকে আমরা দু'জনেই সেকেন্ড ডিভিশন পেয়েছিলাম। কলেজে ভর্তির পর আমাদের বন্ধুত্ব সামান্য ঢিলে হয়ে গিয়েছিলো। আমি তখন রাজনীতি করি, সপ্তাহে একদিন নিয়মিত রাজনীতির ক্লাশে যোগ দিতাম, আমাদের ইমিডিয়েট সিনিয়র কমরেড শ্রেণী-শত্রুকে হিংসা করতে শিখিয়েছিলেন। বাবু কি অন্য শ্রেণী'র? অতোসব বুঝতাম না, পুরো ব্যাপারটাই ছিলো রোমাঞ্চকর কিছু, কিন্তু বাবু'র প্রতি আমার হিংসা জন্মায়নি। বাবু অবশ্য আমার রাজনীতির লাইনকে সোজাসুজি'ই অবজ্ঞা করতো। আমাদের এই মন কষাকষি ছিলো সামান্য দিনের। এই সময় টের পেতাম বাবুর বাবা কতো রকম উপায়ে দু'হাতে টাকা কামাচ্ছে, কিন্তু এসব কোনো ব্যাপার ছিলো না আমার কাছে। আমার ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস সবকিছুই ছিলো বাবুকে এড়িয়ে। ডেইজীকে নিয়েও আমাদের ঝগড়া হতে পারতো। আমাদের সময়ের সবচেয়ে সুন্দরী ডেইজী'কে আমরা দু'জনেই ভালোবাসতাম। সামনাসামনি হলে অপ্রস্তুত হয়ে যেতাম—এরকম ভালোবাসা। সে বয়সে এ অতি সাধারণ ব্যাপার কিন্তু অপ্রতি-রোধ্য। আমাদের দু'ক্লাশ জুনিয়র ডেইজী অবশ্য আমাদের দু'জনকেই কিছু উদাসীন দুপুর ছাড়া আর কিছুই দেয়নি।

ইন্টারমিডিয়েট পাস করার পর পরই আমরা শহর ছেড়ে চলে এলাম। আমার বাবা শেষ বয়সে তহবিল-তসরূপ ধরনের ব্যাপার-স্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিলেন। জেল হলো না, কিন্তু চাকরি থাকলো না। বাবা খুব মুষড়ে পড়েছিলেন, লোভে পড়ে অভাবে পড়ে করে বসা কাজ, কিন্তু লোকজন এতোসব ভেবেচিন্তে কখনোই দেখবে না। মফস্বল টাউনে আমার নানাবাড়িতে মা'র নামে দু'খানা ঘর ছিলো, আমরা চলে এলাম।

সে খুব কষ্টের ব্যাপার ছিলো। ইন্টার মিডিয়েট পাস করেছি, মেয়েদের নিয়ে কিশোর-কালের ধারণা বদলে গেছে, বাবুদের ছাদে বসে পা দুলিয়ে দু'জনে নিয়মিত সিগারেট টানি, বন্ধুরা সব ভার্সিটিতে ভর্তি হচ্ছে—এই সবকিছু আর আজন্ম চেনা এই শহর ছেড়ে যাওয়া কী কষ্টের! যাওয়ার আগে নানারকম কথা মনে পড়ে, মন খারাপ হয়ে যায়। আর মন খারাপ হয় রমিজ কাক'র জন্যে। বাবুদের বাসায় ঢুকলে প্রথমেই হাতের ডানদিকে বাবুর বাবা'র অফিসঘর, তার সংগে লাগোয়া ছোটো এক ঘরে রমিজ কাকু বাবুর বাবার ব্যবসার ফাইল-পত্র গুছিয়ে রাখতেন, হিসেব কষতেন, ফুট ফরমাশ খাটতেন। খুব ছোটোখাটো চেহারা, রোগামতো চোখে ফাটা ফ্রেমের চশমা। দু'টো শার্ট ছিলো তাঁর দু'টোই শাদা কিন্তু এসব কি কোনো ব্যাপার? আমাদের দু'জনকে খুব ভালোবাসতেন। প্রায় সারাটা দিন কাগজ-পত্রের মধ্যে ডুবে থাকতেন, কিসব লিখতেন আর কলিংবেল বেজে উঠলেই বাবুর বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেন। বিকেলের আগে আগে একটু অবসর। আমরা তখন গল্প করতাম। রমিজ কাকু গল্প জানতেনও বটে—এসব অবশ্য ছেলেবেলার কথা। একবার আটআনা পয়সা চেয়েছিলাম, না দিতে পেরে খুব লজ্জা পেয়েছিলেন।

আমাদের গোঁফের রেখা স্পষ্ট হওয়ার পরেও, আমরা যখন মেয়েদের দিকে অন্যভাবে তাকাতে শিখেছি, তখনও সম্পর্কটুকু নষ্ট হয়ে যায়নি। বাবু তার বাড়ির টিউটর ছাড়াও কাকুর কাছ থেকে পরীক্ষার পড়া বুঝে নিয়েছে, আমিতো বটেই। আমরা যেদিন মফঃস্বল টাউনে চলে যাবো, তার আগের দিন বাবুদের বাসায় মিলাদ। বাবু পাস করেছে তাই। রাতের খাবারও আমার সেখানে সারার কথা। মিলাদের পর বন্ধুরা একে একে বিদায় নেয়। আমার খুব খারাপ লেগেছিলো। তারপরে আমার নিজের ফেরার সময় বাবুর বাবা-মাকে সালাম করি। বাইরে বেরিয়ে রমিজ কাকুর সংগে দেখা। সালাম করলে দোয়া করতে করতে রুমালে চোখ মোছেন। 'ভালো থেকো রঞ্জু, মন দিয়ে পড়া-শোনা করো, তোমার কাকুর খবর নিও মাঝে মাঝে।' আমিও কেঁদেছিলাম তখন কতোরকম দুঃখ মিলেমিশে আমার গলার স্বর বুজিয়ে দিয়েছিলো।

বাবুর সংগে আমার আবার দেখা হলো দু'বছর পর। এই দু' বছরে মানব জীবনের অনেক কিছু আমার জানা হয়ে গেছে। তহবিল-তসরুপের হাঙ্গামা, চাকরি হারানো বাবার শেষ বয়সের শরীর-মনে সয়নি। মাস ছ'য়েকের মধ্যে মারা গেলেন। তারপর যৎসামান্য ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে কতোরকম ভাগ -বাটোয়ারা, নোংরামী—আমাকেই এসব বুঝে নিতে হয়। সময় করে বাবুকে চিঠি লেখা হয় না। ও লিখতো আরো কম। প্রথম প্রথম সপ্তাহে সপ্তাহে চিঠি, আবেগ—এসব সময়ের টানে খসে যায়। তবু আমা

PHILIPS

ফিলিপ্‌স

ফিলিপ্‌স-এর নতুন ২০" রঙিন টিভি অনুপম ফিলিপ্‌স নৈপুণ্য ও ইলেকট্রনিক চমৎকারিত্বের এক বিস্ময়কর অবদান। প্রাণবন্ত, সজীব ছবি এবং রঙের নিখুঁত পরিস্ফুটনের জন্যে ফিলিপ্‌সই বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ রঙিন ও সাদা কালো টিভির নির্মাতা।

অল ট্রানজিস্টার এই টিভি সেট এখানকার আবহাওয়ার উপযোগী করে বিশেষভাবে তৈরী। নিমিষেই পর্দায় রঙিন ছবি আর চমৎকার শব্দের ঝংকার ছাড়াও প্রতিটি ফিলিপ্‌স রঙিন সেটই একাধিক বৈশিষ্টমণ্ডিত। এতে রয়েছে কিছু বাড়তি সুবিধা যেমন হেড ফোন, ভিডিও গেম ও ভিসিআর সংযোগ।

আর সে জন্যেই বিশ্বের সব জায়গায় যে কোন রঙিন টিভি ক্রেতার কাছে ফিলিপ্‌সই এক নম্বর চাহিদা।

এছাড়া প্রতিটি ফিলিপ্‌স রঙিন টিভির সাথে রয়েছে বিনামূল্যে এক বছরের দক্ষ বিক্রয়োত্তর পরিচর্যা আর তিন বছরের জন্যে পিকচার টিউবের গ্যারান্টি।

ফিলিপ্‌স অনুমোদিত ডিলারদের কাছে খোঁজ করুন।

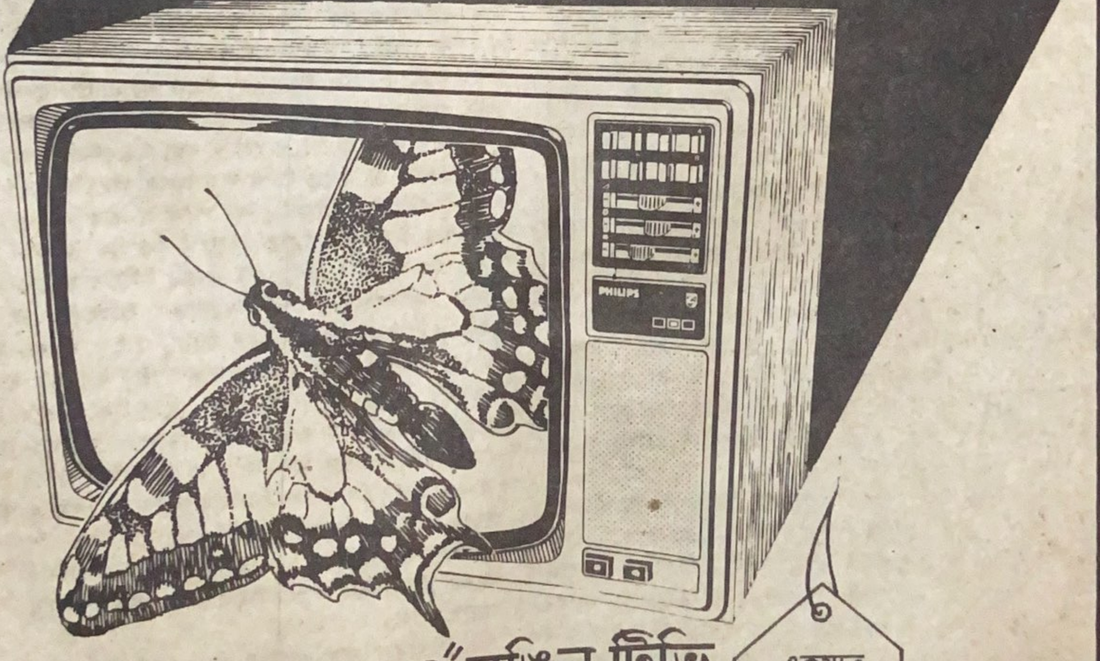

ফিলিপ্‌স-এর ২০" রঙিন টিভি ইলেকট্রনিক নৈপুণ্যের এক বিস্ময়কর প্রতিচ্ছবি

একমাত্র
ফিলিপসই দেয়
স্বাভাবিক
রঙের নিশ্চয়তা

adking

বাংলাদেশের যে কোন স্থানে টেলিভিশনের রঙিন অনুষ্ঠান মালা ফিলিপস রঙিন টিভিতে উপভোগ করা যায়

দের নিয়মিত একটা যোগাযোগ বজায় ছিলো বৈকি। অন্যান্য বন্ধুরা মাঝে মধ্যে লিখতো—'বাবু'র কথা বলিস না, ওর বাবা দু'হাতে পয়সা কামাচ্ছে, দু'হাতে, ওর নতুন নতুন বন্ধু হয়েছে।' দূর থেকে এসব আমার কাছে কোন ব্যাপার ছিলো না। আর নতুন নতুন বন্ধু—এতো সময় পরিবেশ মানসিকতার ব্যাপার।

বি, এ, পরীক্ষা দিয়ে টুকটাক বৈষয়িক ঝামেলা কাটিয়ে ঢাকা যাওয়ার সময় পেলাম। উঠলাম ছোটো চাচার বাসায়। বাবার সংগে ছোটো চাচা'র বনিবনা ছিলো না, কিন্তু আমার এসব নিয়ে মাথা ব্যথা নেই, আর তাছাড়া আর কোথায়ই বা উঠবো। বাবু'কে আগেই লিখেছিলাম। বিকেলের দিকে ওদের বাসার সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম। এই দু' বছরে শহর অনেক বদলেছে বৈকি, শহরতো এভাবেই বদলায় সাথে সাথে বাবুদের বাড়িও। ওদের সেই ফকফকে শাদা। একতলা বাড়ি এখন দোতলা। সেই শাদা পরীর মতো ভাবটা অবশ্য রয়েই গেছে। দখিন মুখো বাড়ি, দোতলায় প্রচুর বাতাস। বাবুর ঘর দোতলায় বা'দিকে, সামনে গ্রীল ঘেরা একফালি বারান্দা, ইচ্ছে করলে ওখানে বসে সারারাত গল্প করা যায়। আমরা দু'জন অবশ্য পুরো বিকেল বারান্দা ছেড়ে উঠলাম না। প্রথম প্রথম কথা এগোচ্ছিলো না, এরকম হয়, আমাদের দু'জনের মুখেই লাজুক হাসি, আমি বলি তুই নাকি খুব বদলে গেছিস।' বাবু হাসে—'খুব, তুই নিজেই দেখতে পাবি।' এভাবে আরম্ভ হয়, তারপর আমাদের কথা আর ফুরোয় না।

বাবুর বাবা বিদেশে। ওর মাকে সালাম করে আর নানা কথার জবাব দিয়ে বাবুর ঘরে এসে বসি। এ্যলবামে পুরনো দিনের ছবি দেখি, হাসাহাসি করি। আমার মফঃস্বলের জীবন খুব সীমা-বদ্ধ, আমার নিজের কথাতাই সহজেই ফুরোয়। বাবুর রাজ্যের কথা, মাঝেমধ্যেই অচেনা দু'একজনের নাম, ওরা বাবু'র নতুন বন্ধু।

সন্ধ্যেয় সেই লাগোয়া বারান্দায় চেয়ারে বসে পা দুলিয়ে চা খাই। বাবু খুব সিরিয়াসলী বললো ও বিদেশ চলে যাওয়ার কথা ভাবছে, এর মধ্যে অনার্স হয়ে গেলে ভালো হয়, তবে সামনের জানুয়ারীর কোর্স ধরতে পারবে, ক্যালিফোর্নিয়ায় ওর এক খালা আছে, গিয়ে কোনো অসুবিধেয় পড়তে হবে না! এসব শুনে আমার কিছুটা খারাপ লাগে। বাবু খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু, বিদেশে বহুদূরে চলে যাবে এই খারাপ লাগার সংগে কিছু হিংসেও জড়িয়ে ছিলো।

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম—'বিদেশ যাওয়া ভালো, লেখাপড়া ভালো হয়, তবে দেখ দেশের টাকা খরচ করে ওখানে লেখাপড়া শিখে কেউ আর দেশে ফিরতে চায় না।' বাবু হাসলো—'আমারও কিন্তু ফিরতে ইচ্ছে করে না ওখানে লাইফ আছে, যা ইচ্ছে করো......।' 'আমার বিদেশ ভালো লাগে না'—আমি গম্ভীর হয়েই বললাম। বাবু সেটা লক্ষ্য করলো না।—'তুই তো অন্য ধরনের, তোর যে দেশছাড়া কিছুই ভালো লাগবে না তাতো জানিই।' এরপর আর কিছু বলা যায় না, আমি চুপ করে থাক-লাম, যাক তবু ওখানকার বন্ধুদের বলতে পারলে আমার খুব ঘনিষ্ঠ এক বন্ধু বিদেশে থাকে, বাবুর চিঠি-ফটো এসব দেখাতে পারবো।

রাতে আমাকে খেয়ে যেতে হবে বাবুর মা বলে দিয়েছেন। সন্ধ্যের পর আমরা জনাকয়েক বন্ধুদের বাসা থেকে ঘুরে এলাম, স্কুলের স্যারদের সংগে দেখা করলাম। ফিরে এসে হাত মুখ ধুয়ে নেই। বাবু প্লেয়ারে রেকর্ড চাপিয়ে কি এক কাজে নীচে নেমে গেলো। আমি বারান্দায় এসে বসলাম। সামান্য রাত হয়েছে। বারান্দায় প্রচুর বাতাসের লাফালাফি। ভারী ভালো লাগে। পুরনো দিনের নানা কথা হঠাৎ হঠাৎ মনে পড়ে যায়। আর হঠাৎ করেই মনে পড়ে যায় রমিজ কাকুর কথা। কী লজ্জা, এতো-ক্ষণ হলো এসেছি একটি বারও মনে পড়েনি, বাবুকেও জিজ্ঞেস করা হয়নি। রমিজ কাকু'র সামনে এখন দাঁড়াবো কি করে? রেলিং ঘেষে দাঁড়িয়ে বাবু'র বাবার অফিসরুমের লাগোয়া ছোটো ঘরটা দেখে নেই। হ্যাঁ আলো জ্বলছে। হেলে পড়ে চেষ্টা করলে সে ঘরের জানালা গলিয়ে ভেতরের কিছুটা চোখেও পড়ে। রমিজ কাকু আমার দিকে পেছন ফিরে, শুধু পিঠের এক অংশ আর কখনো কখনো চুলের কিছু কিছু। সেই শাদা শার্ট আর কাঁচা পাকা চুল দেখে রমিজ কাকুকে চিনতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হয় না। আমি আর মুহূর্তও দেরি করি না। তরতর করে নীচে নেমে গিয়ে সে ঘরের দরজা ঠেলে 'রমিজ কাকু, কেমন আছেন' বলে ঢুকে যাই। কাগজ-পত্র থেকে রমিজ কাকু, না রমিজ কাকু নয়, সে রকম চেহারার অন্য এক লোক চোখ তুলে আমার দিকে তাকায়। আমি অপ্রস্তুত হয়ে গিয়ে বললাম—'কিছু মনে করবেন না, আমি ওপর থেকে আপনাকে রমিজ কাকু ভেবেছিলাম এখানে আগে কাজ করতেন আপনার সংগে খুল মিল!' সে লোক কলম বন্ধ করে সামান্য হাসে, চুলগুলো ঠিক করে নেয়—'হ্যাঁ বাবার সাথে আমার চেহারার খুব মিল।' আমি সামান্য আশ্বস্ত হলাম—'ও, তবে আমার খুব একটা ভুল হয়নি কাকু কেমন আছেন ?' রমিজ কাকুর ছেলের গলার স্বর একটুও কাঁপলো না—'বাবা মারা গেছেন মাস ছ'য়েক হলো, আমি আগে ছোটোখাটো এক দোকান চালাতাম, তারপর থেকে এখানে আছি।' এবার আমি খুব চমকালাম—'কাকু মারা গেছেন ?' 'হ্যাঁ—সে মাথা নাড়লো—'বয়স হয়েছিলো; শরীর খারাপ যাচ্ছিল, তারপর একদিন হঠাৎ।' কথা শেষ করে সে সামান্য হাসে। আমি বললাম—'আমি জানতাম না, আমি বাবু'র বন্ধু অনেকদিন হলো ঢাকার বাইরে আছি এখানে থাকার সময় কাকু আমাদের খুব আদর করতেন।' তার সাথে বেশি কথা হয় না ; কিইবা বলবো। অচেনা লোকের সাথে সহজেই মানিয়ে নিতে পারি না। ফিরে এসে বাবু'কে জিজ্ঞেস করেও দায়সারা জবাব পাই। 'না খেয়াল ছিলো না, আর খবর দিলে তো তোর মন খারাপ হয়ে যেতো'—এসব বলে গুরুত্বহীন ভাবে ব্যাপারটা এড়িয়ে যায়। এটা যেনো ওর কাছে কোনো ব্যাপারই নয়। কিন্তু আমার মন খারাপ হয়েই থাকলো।

চারদিন ছিলাম ঢাকায়। বাবু'র সাথে ঘুরে ফিরে সময় কেটে গেলো। বাবু'দের এখন রমরমা অবস্থা আগে খারাপ ছিলো এমন নয় তবে এখন ফাঁকফোকড় গ'লে প্রাচুর্য উপচে পড়ে। ওর ঘরে কতোরকম জিনিস তার অধিকাংশের আমি ব্যবহার জানি না। একবার ফোর-ট্র্যাক কী এক টেপ-রেকর্ডারের স্পুল বদলে দিতে বললে খুব লজ্জায় পড়েছিলাম। কি করবো এসব ব্যাপার মুখ ফুটে সহজে বলাও যায় না। খুব কায়দা করে এড়িয়ে গিয়ে-ছিলাম। বাবু অবশ্য বদলায়নি। বিদায়ের সময় আগের মতই ম্লান হয়ে যায়—'চিঠি লিখবি তো, আমি কথা দিচ্ছি আমি নিয়মিত লিখবো, কসম।'

বাবু'র সাথে তারপর সাত মাস আর দেখা হলো না। ফিরে এসে আমার আর এম, এ ক্লাশে ভর্তি হওয়া হলো না। সাংসারিক চাপ পাশের গ্রামের স্কুলে খুব সহজেই চাকরি পেয়ে যাই। এ গ্রামে আমাদের কিছু জমি ছিলো, আর ছোটখাটো টিনের একটা বাড়িও। মা মামা'রা সবাই এখানেই চলে আসি। বাবু লিখেছিলো, আমার নাকি হুট করে আবোল তাবোল কিছু করে বসার বাতিক আছে, এই যেমন পড়াশোনা ছেড়ে চাকরি নিলাম ইচ্ছে করলে এম, এ শেষ করেও এসব করা যেতো। সে যাক বাবু তো আমাদের অনেক কিছু জানতো না, প্রিয় বন্ধু'কেও অনেক কিছু

খুলে-মেলে বলা যায় না। আর তাছাড়া লেখাপড়া শেষ না করেই স্কুল মাস্টারীর চাকরি—এ নিয়ে আমার কোনো মনঃ বেদনা ছিলো না। এসবের সাথে অনেক আগেই মিশে গেছি।

কিন্তু এখন কবিতা লেখা মাথায় উঠলো। এ কী চিঠি বাবু'র ! সামনের মাসের প্রথম সপ্তাহেই বিদেশ চলে যাচ্ছে, ডেট ফাইনাল হয়ে গেছে। অবাক করা ব্যাপার, গত চিঠিতেও এসব কিছু লেখেনি, ও যেন ওত পেতে ছিলো আমাকে সার-প্রাইজ দেবে বলে। তা দিলোও বটে। কিন্তু আমাকে তো যেতেই হয়, এতো করে লিখেছে, আর আবার কবে দেখা হবে কেউ জানে না ওর যা স্বভাব, হয়তো আর ফিরলোই না। ছুটি পাবো তো ?—সেটা বোধ হয় সমস্যা হবে না, ইতিমধ্যে ফাংশন হয়ে যাবে, আর হেড-মাস্টারের সাথেও ভালো সম্পর্ক। একটু বলে-কয়ে নিলেই হবে।

ফাংশনের পর ছুটি পেয়ে গেলাম। ইচ্ছে ছিলো দিন দুই আগে যাবো, তা হলো না। মা'র হার্টের অসুখ সামলাতে ছু'টির দু'দিন গেলো। যে দিন ঢাকা পৌঁছলাম তার পরদিন বিকেলে বাবু চলে যাবে, আর সেদিন সন্ধ্যেয়ই পার্টী।

বাবু'দের বাসায় সামনে দাঁড়িয়ে আমি আরেকবার চমকালাম। দোত'লার ওপর আরেকতলা উঠেছে, এখন তিনতলা। খোল--নলচে অনেক কিছুই পাল্টে গেছে। সেই শাদা রঙ নেই, সেই উড়ে যাওয়া ভঙ্গির সাদা পরীও নেই। কিন্তু সবকিছু মিলিয়ে কী চমৎকার ডিজাইন, এমন খোলামেলা যেন পৃথিবীর সব বাতাস বাবুদের পুরো বাড়িময় নেচে বেড়াবেই। পরে বাবু বলেছিলো ওর বাবা বিজনেস ট্যু'রে আমেরিকায় থাকার সময়ই প্লানটা করে এনেছিলেন, লেটেস্ট ডিজাইন, আর কি কি সব টেকনিক্যাল ব্যাপার-স্যাপার সেসব আমি বুঝলাম না। বাবু'র অবশ্য মুখ-গোমড়া—'একেবারে শেষ দিনে এলি, কতো কি করবো ভেবেছিলাম।' সব খুলে-মেলে বলে ওর রাগ ভাঙাতে হয়। আমরা তে'তলায় এসে বসেছি। একতলা জুড়ে বাবুর বাবার অফিস, ভিজিটিং রুম, এসব। দো'তলা খালি পড়ে আছে মাস-খানেক হলো ওরা তে'তলায় এসে উঠেছে। তেতলা অল মোজা-ইক আমার পা বারবার পিছলে যেতে চায়। বাবুর ঘর আগের মতোই কোণ ঘেষে, দক্ষিণের বাতাসের মুখোমুখি। ঘরে এয়ার-কন্ডিশন, বাথরুম এতো সুন্দর ব্যবহার করতে সংকোচ হয়, ঘরে হাজার রকম ইলেকট্রিক্যাল যন্ত্রপাতি। বাবু অবশ্য বদলায়নি।

দুপুর বেলা'র আগে আগে এসে পৌঁচেছি: তারপর সন্ধ্যে পর্যন্ত সারাটা সময় বাবুর সাথে টো টো করে ঘুরতে হলো। কতোরকম কাজ ! সবচেয়ে বড় ব্যাপার আজ সন্ধ্যেয়ই পার্টী সে এক এলাহী ব্যাপার হবে প্রস্তুতি দেখেই বুঝেছিলাম। এসব কাজেই দু'জনে ঘুরেছিলাম, ঝক্কি নেই অবশ্য, বাবু'দের দু'টো গাড়ির একটা আমাদের জন্যে। এক ফাঁকে বাবু আমাকে খুব সুন্দর একটা শার্ট আর প্যান্টের কাপড় কিনে দিলো। খুব দামী কাপড়, অনেক টাকার ব্যাপার। আমি মুখে না না করলেও বাবু শুনলো না—'চুপ, আবার কবে যে দেখা হবে, কতোদিনের বন্ধু আমরা।' শুনে আমার সামান্য লজ্জা লাগে বৈ কি, আসলে আমারইতো কিছু একটা দেওয়া উচিত ছিলো। অথচ আগে খেয়াল ছিলো না, এসব কায়দা কানুনে তো অভ্যস্থ নই।

সন্ধ্যে'র আগে বাবুর ঘরে বসে চা শেষ করে সিগারেট ধরাই। সব কাজ ইতিমধ্যে প্রায় শেষ। বাদবাকী ব্যাপারগুলো অন্যান্য লোকজন দেখা শোনা করছে। কিছুক্ষণ আগেও বাবু'র কয়েকজন বন্ধু ছিলো আমাদের সাথে। তারা সবাই চলে গেছে। অবশ্য সন্ধ্যেরপরপরই তারা ফিরে আসবে। বাবু বললো—'তোর সাথে একটা মেয়েব আলাপ করিয়ে দেবো। আমি সামান্য ভড়কাই, মেয়ে ! এসব ব্যাপারে আমি ল্যাগবেগে। বাবু বললো—'মেয়ে তোর কথা অনেক শুনেছে, তুই যে কবিতা লিখিস জানে, গত পরশুই বলছিলো তুই এলে যেনো আলাপ করিয়ে দেই।' একটু একটু লজ্জা পেলাম—'ধ্যাৎ, কবিতা লিখি এসব কেন বলতে গেলি, কি এমন লিখি।' বাবু মাথা নাড়লো—'কবিতা আমি খুব একটা বুঝি না, কিন্তু তুই লিখিসতো, আর এদিক-ওদিকতো ছাপা হয় 'প্রবাল এ যেটা ছাপা হয়েছে সে কপিটা আমার কাছে ছিলো, মেয়েটা দেখলো।' কবিতা ছাপা হলে সেটা কিছু লোক পড়বেই, কিন্তু যখন আলাদা করে শুনি বিশেষ একটা মেয়ে পড়েছে তখন এ এক অদ্ভুত আনন্দ। বুকের ভেতর শিরশির করে।

সন্ধ্যে'র পবপরই অতিথিরা আসতে আরম্ভ করলো: প্রস্তুতি দেখে আর বাবু'র মুখে সামান্য শুনেই বুঝেছি এরকম পার্টী আমি আগে একটিও দেখিনি। মাঝরাত পর্যন্ত চলবে হৈ-হুল্লোড়, গান-নাচ, এসব ; আজকাল এরকমই নিয়ম। মাঝ-রাতের আগে পার্টী ভেঙে কেউ নিজের আভিজাত্য খোয়াতে চায় না, বাবু'ও না।

বিকেল থেকেই অবশ্য আসতে আরম্ভ করেছে বাবু'র আত্মীয়'রা। এখন আসছে বাবু'র বন্ধুরা। ছেলে-মেয়ে সবাই বন্ধু, কেউ বান্ধবী নয়, বান্ধবী বলে মেয়েদের আলাদা করে চিহ্নিত করা এক বাজে ব্যাপার, বাবু আমাকে আগেই কথায় কথায় বলেছে। অবশ্য শারীরিক গঠন ছাড়া ওদের আলাদা করে চেনা কঠিনও বটে। কি বলবো হ্যাঁ খুব মাইডিয়ার ভাব। ওদের হাঁটা-চলা কথা-বার্তা সব অদ্ভুত খুব ফুরফুরে। আমি ঠিক খাপ-খাওয়াতে পারি না। এই কয় বছরে যে ব্যবধান তৈরি হয়েছে আমার পক্ষে তা এই অল্প সময়ে অতিক্রম করা সম্ভব নয়।

আমার আর বাবুর দু'তিনজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর ওপর ভার ছিলো অতিথিদের প্রাথমিক তদারকির। কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই সহজ নয় কি করতে কি করে বসবো শেষ পর্যন্ত সে ভার অন্যদের ওপর ছেড়ে দিয়ে আমি একপাশে এসে দাঁড়ালাম। আর কিইবা করবো ? আমি কিছু করছিনা বলে কারো কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। সবাই মুহূর্তের মধ্যে আর সবার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। আর বাবুও খুব ব্যস্ত এদিক-ওদিক করে আর এর-ওর দিকে হেসে হেসে হয়রান।

মেয়েটার সাথে বাবু আলাপ করিয়ে দিলো অনেক পরে। তখন নতুন করে কেউ আসছে না। তে'তলার এই বিরাট ড্রইং-রুম আর সামনের বড় বারান্দা জমজমাট। বাবু'র যে কতো আত্মীয়-স্বজন আর বন্ধু বান্ধব ! সবাই নিজেদের মতো এখানে ওখানে জটলা পাকিয়ে। কিছু একটা নিয়ে থাকলে অস্বস্তিটুকু কাটানো যায়। এই যেমন সিগারেট কিন্তু মুরুব্বীদের সামনে সিগারেট ধরানো উচিত হবে না। বাবুর অনেক বন্ধু অবশ্য তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না দিব্যি চালাচ্ছে। এদের সাথে মিশে গিয়ে আমিও পারি আর কেইবা আমাকে চেনে। তবু শেষ পর্যন্ত একটা কেকের বোতল হাতে একপাশে সরে এলাম। বাবু তার পরপরই সাথে একটা মেয়ে নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। ও হরি এই মেয়ে ! একেতো পার্টীর প্রথম থেকেই দেখছি খুব ছটফটে আর পার্টীতে এমন কেউ নেই যাকে মেয়েটা চেনে না সবার সাথে কথা বলছে কোথাও দাঁড়াচ্ছে না এক মুহূর্ত। পরনে চামড়া কামড়ানো জীনসের প্যান্ট আর ওপরে-ওটা কি শার্ট শার্টের মতোইতো তা বিশেষ কোনো নাম-টাম থাকতেও পারে। বাবু খুব ব্যস্ত মেয়েটার দিকে ফিরে বললো—'ইভা এর কথাই

তোমাকে বলেছিলাম কবিতা লেখে...রঞ্জু তোরা আলাপ কর।' মেয়েটার হাতেও একটা কোকের বোতল স্ট্র-এর ওপর লিপস্টিকের সামান্য দাগ। বাবু কথা শেষ করলেই মেয়েটা আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো—'হাই।' আমারও হাই বলা উচিত জানি ; কিন্তু অ আর মুখ ফুটে বেরোয় না আমি একটু হাসি। মেয়েটা কপাল থেকে চুল সরায়—'আপনি কবিতা লেখেন না? বাবু বলছিলো আপনারা নাকি বহুদিনের বন্ধু যখন মেয়ার কিছু ছিলেন তখন থেকে?' কি বলবো এসব প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই একটু মাথা নাড়ি একটু হাসি। কী টরেটক্কা মেয়েরে আর শার্টের ওপরের বোতাম এভাবে কেউ খুলে রাখে ঘুরে ফিরে চোখ আটকে যায়।

মেয়েটা আমাকে প্রায় টেনে নিয়ে গেলো বারান্দায়-ঘরে খুব ক্যাওয়াস এখানে কথা বলা যাবে।......জানেন আপনার একটা কবিতা আমি পড়েছি।' এসব মুহূর্তে বোকার মতো হাসা ছাড়া কিইবা করার থাকে। বললাম 'হ্যাঁ শুনেছি বাবু আমাকে বলেছে আমি অবশ্য খুব কম লিখি।' মেয়েটা এদিক-ওদিক তাকিয়ে কোকের খালি বোতলটা টুপ করে ফেলে দেয় নীচে বাগানে নরম মাটির ওপর পড়লে সামান্য শব্দ হয় মেয়েটা বাচচা'র মতো সেদিকে তাকিয়ে মাথা দোলায় হাসে তারপর বলে—'আমি না কবিতা বুঝি না কিন্তু আপনাকে আমার খুব ভালো লাগছে আপনি বেশ ইন্টেলেকচুয়াল টাইপের না? আমি খুব চেষ্টা করি সহজ থাকার মেয়েটা আমার কাঁপুনী যেন টের না পায়। মেয়েটা অবশ্য এসবের কিছু লক্ষ্য করে না মাথা দুলিয়ে সহজ গলায় বলে—'আচছা আপনি আমাকে নিয়ে একটা কবিতা লেখেন না আমার খুব ভালো লাগবে। সেতো লিখবোই কিন্তু গুছিয়ে তাকে কিছুই বলতে পারি না মুখ ফস্কে প্রগলভ বেরিয়ে যায়—'জানেন সত্যি বলছি আপনি নিজেই না একদম কবিতার মতো।' মেয়েটা ভ্রূ কোঁচ কালো অবাক হয়ে তাকালো—'কি বললেন ক্যাহ-স্ট গেটয়ু আপনাদের কথা অবশ্য বোঝা মুশকিল। আমি তখন বোকার মতো হাসি বলে ফেলেছি বটে কিন্তু এ মেয়েকে বলে বোঝাতে পারবো না। মেয়েটা আরেকটু কাছে এগিয়ে আসে ফিশফিশ করে বলে—'আপনি আন্ডারগ্রাউন্ড পার্টী করতেন না? বাবু বলেছে বিলিভ মি আমি না টেরোরিস্টদের খুব লাইক্ করি, এ্যাডভেন্চার আমার খুব ভালো লাগে এখন আমার ফেভারিট প্যাট্রিসিয়া হার্স্ট।' আমি কিছু বলার আগে দূর থেকে মেয়েটাকে একজন ডাকলো। 'ও হাই রবি, ওয়াট'স নিউ'—মেয়েটা এখান থেকেই চেঁচিয়ে বলে, আমার দিকে ফেরে—আমি একটু আসছি, আপনার সাথে আমার অনেক কথা আছে।' মেয়েটা চলে গেলে পারফিউমের গন্ধ আমাকে ঘিরে রাখে, আর সে সুগ্রাণ ছেঁদ করে 'এ্যাডভেন্চার' শব্দটা তুমুল বেজে যায়।

মেয়েটা ফেরে না। আমারও কিছু করার নেই। বারান্দার কোনে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে মানুষগুলো গুণতে চেষ্টা করি, সময় কাটানো। সেখান থেকে সরে এসে অন্যদিকে হাঁটতে নিলে পাশ থেকে একটা মেয়ে ফিশফিশ করে বললো—'আপনি ইভা'র সাথে কথা বলছিলেন যে মাইন্ড ইট, শি'জ অ্যা সেকেন্ড ক্লাশ হোর।' আমি একটু চমকালাম, কিন্তু দাঁড়ালাম না। এ বড় ভয়ংকর ব্যাপার কোথায় আটকে যাবো কে জানে। কিন্তু কিছু একটা করা দরকার, বৈকি। আমি একবার ঘরে ঢুকি, একবার বারান্দায় আসি, আবার ঘরে ফিরে যাই। কি করবো রেকর্ডে দারুন মিউজিক তার সাথে সাথে অনেকের শরীর দোলে, মেয়েটাকে একপাশে দেখলাম তিনটে ছেলের সাথে খুব ব্যস্ত, বাবু এককোণে খুব রূপসী একটা মেয়ের সাথে মাথা নীচু করে কথা বলছে। আমার

এমন পরিচিত কেউ নেই, যারা অল্প পরিচিত স্কুল জীবনের দুএকজন পুরনো বন্ধু তারা নিজেদের মধ্যে এতো মগ্ন—আমি তার ভেতরে ঢুকতে পারবো না।

দু'প্যাকেট দামী সিগারেট ছিলো আমার সাথে। বাবু দিয়েছিলো। কখনও কারো যদি প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু তার প্রয়োজন নেই। আমি ঘর ছেড়ে ছাদের সিঁড়ির দিকে এগোই। সিঁড়ির কোনে আবছায়ায় দু'জন দু'জনকে জড়িয়ে ধরে, আমি সে দিকে দ্বিতীয়বার তাকালাম না।

আজকের চাঁদের আলো নেই। মৃদু বাতাসে অন্ধকার ভেসে বেড়ায়। আমি পা টিপে টিপে রেলিঙের কাছে পেঁছে যাই, স্বস্তিবোধ করি, সিগারেট ধরাই। তারপর অনেক দূরে তাকিয়ে থাকি। তে'তলার অমন জোর বাজনাও স্পষ্ট হয়ে পেঁছায় না এখানে যেটুকু পেঁছায় সেটুকু ভালো লাগে। রেলিঙের ওপর দু'হাতের ভর রেখে শরীর ভেঙে দাঁড়াই। সিগারেটে মৃদু টান দিয়ে এদিক-ওদিক তাকাই। আশে পাশের বাড়ি'র জানালার পর্দা বাতাসে উড়ে উঠলে দেখা যায় ভেতরের মানুষ জনকে। কতোরকম মানুষ।

নীচের দিকে চোখ যায়। মেয়েটা এই বরাবর একটা কোকের বোতল ফেলেছিলো বাগানে। নীচে বাগানে সামান্য আলো এই আবছায়ায় দেখা যাবে না, তবু চেষ্টা করি। বৃথা চেষ্টা সেটা মিশে গেছে মাটির সাথে, কিংবা কোনো গাছের আড়ালে। কিন্তু অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটে গেলো। সেই কোকের বোতল খুঁজতে খুঁজতে আমার চোখ চলে গেলো এক তলায় বাবু'র বাবার অফিস রুমের লাগোয়া ছোটো ঘরে। আলো জ্বলছে। রমিজ কাকু? কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হলো না, রমিজ কাকু মারা গেছেন, গতবারই জেনে গেছি। তবে রমিজ কাকুর ছেলে গতবার আলাপ হয়েছিলো। আমি ভালো করে দেখার জন্যে ছাদের এককোণে সরে যাই। হ্যাঁ দেখা গেলো, রমিজ কাকুর ছেলেই অবিকল তার মতোই বসে থাকার ভঙি। এভাবে এখানে দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে নীচে গিয়ে কথা বলি, সেই ভালো। গতবার মোটামুটি আলাপ হয়েছিলো। নীচে নামতে নামতে খারাপ লাগলো। আজকের এই দিনেও কাজ! ছিঃ বাবু'র উচিত হয়নি।

ভেতরে ঢুকে গেলাম। কিন্তু চমকেও গেলাম। না, রমিজ কাকুর ছেলে নয়। সে রকম মুখের আদল, কিন্তু অন্য লোক। লোক বলবো না, ছেলে খুব অল্প বয়স। ফাইলপত্র গুছিয়ে রাখছিলো আমার দিকে অবাক হয়ে তাকালো। আমি বললাম—'আমার ভুল হয়ে গেল, এর আগে যে ভদ্রলোক কাজ করতেন তাকে চিনতাম; ছাদ থেকে দেখে ঠিক বুঝতে পারিনি। ছেলেটা সামান্য হাসলো—'ও, আমার বাবাকে চিনতেন বোধ হয়।' আমি অবাক হই—আপনার বাবা, মানে......রমিজ কাকু আপনার কে?

ঃ আমার দাদা, আপনি কাকু বলতেন বুঝি?

ঃ হ্যাঁ, কিন্তু গতবার আপনার বাবাকে দেখেছিলাম তিনি কোথায়?

ছেলেটা সামনের স্তূপাকার কাগজ-পত্রের দিকে তাকিয়ে সামান্য হাসে—'মাস তিনেক আগে ডানদিকটা অবশ্য হয়ে গেলো, বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেন না, আমি কলেজে পড়তাম ভাগ্য ভালো অন্য কারো বদলে চাকরিটা আমিই পেলাম।' আমি বললাম—'ও।

তারপর আবার ওপরে উঠে আসি। সিঁড়ির কোনে আবছায়ায় আরো কয়েকজন। তেতলায় রেকর্ডে এখন এতো বাজছে আনন্দ-সঙ্গীত, ছাদেও তা এসে পেঁছায় বাতাসের সাথে মিলে-মিশে নাচানাচি করে। আমি আরেকটা সিগারেট ধরালাম।

লেখালেখি

সমালোচনা

গিলগামেশ

আবদুল মতিন খান

গিলগামেশ খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে আক্কাদিয় ভাষায় কাব্যাকারে রচিত একটি বীরগাথা। এ পর্যন্ত যতো প্রাচীন মহাকাব্য আবিষ্কৃত হয়েছে 'গিলগামেশ' তার মধ্যে প্রাচীনতম। সেকালের সর্বাধিক জনপ্রিয় এ কাব্যে ৩৫ হাজার পঙক্তি আছে। প্রাচীন মেসোপটেমিয়ায় (বর্তমান ইরাক) নগর রাজ্য এরেক-এর প্রতাপশালী রাজা গিলগামেশকে নিয়ে এ কাহিনী রচিত হয়েছে। এর রচয়িতার নাম জানা যায়নি। প্রায় এক হাজার বছর ধরে ঐ এলাকার মানুষের মুখে মুখে এ কাব্য প্রচলিত ছিলো। তারপর আড়াই হাজার বছর আগে তৎকালীন রাজা আসুর বানিপালের আদেশে তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরীর জন্যে এ মহাকাব্যটি মৃৎফলকে গ্রন্থাবদ্ধ করা হয়।

বীর্যবান পুরুষ গিলগামেশ তখন মর্ত্যের সর্বেসর্বা। তাঁর সমকক্ষ শক্তিমান মানুষ আর দ্বিতীয়টি নেই। সমস্ত তল্লাটে যথেচ্ছ কাজ করার অধিকার তাঁর আছে। তাই এক সময় অনন্যোপায় অভিজাত, শ্রমিক ও যোদ্ধাকুলের ৩ প্রতিনিধি দেবতার দরবারে নালিশ জানালো, তাদের জান-কুল-মান-আভিজাত্য আর রক্ষা করা যাচ্ছে না। শৌর্য-বীর্য অসাধারণ শক্তিমান রাজা গিলগামেশ সব হরণ করে নিয়েছেন। দেবতাদের দলনেতা দেবাদিব আনু গিলগামেশকে শায়েস্তা করতে তাই বন্য ষাঁড়-সদৃশ বলবান পুরুষ এনকিদুকে সৃষ্টি করলেন। কিন্তু গিলগামেশের পরাক্রম শক্তির কাছে এনকিদু হেরে গেলো। দেবতা-বুদ্ধি প্রথমবারের মতো হোঁচট খেলো। গিলগামেশ কিছুদিন পর এনকিদুকে নিয়ে সূর্যদেব শামাশের সহায়তায় দৈত্য হুম্বাকে পরাজিত করলে স্বর্গের প্রেমের দেবী ইশতার গিলগামেশকে প্রেম নিবেদন করলেন। গিলগামেশ তা প্রত্যাখ্যান করলে স্বর্গে সভা বসলো গিলগামেশকে শাস্তি দেয়ার জন্যে। কিন্তু শামাশের জোরে গিলগামেশের কোন শাস্তি হলো না, অভিশাপ গিয়ে পড়লো গিলগামেশের প্রিয় সখা এনকিদুর ওপর। এনকিদুর করুণ মৃত্যু দেখে গিলগামেশের মনে অমরত্বের কামনা জাগলো। তারপর অমরত্বের জন্যে তাঁর একের পর এক কষ্টসাধ্য সংগ্রাম চললো। কিন্তু মানুষ অমর নয়, দেবতা অমর! অতএব, গিলগামেশের আশা কিছুতেই পূরণ হওয়ার নয়। এখানেই এ মহাকাব্যের ইতি।

আবদুল মতিন খান তাঁর এ গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন, মানুষের চেয়ে বড় এই দেবতারা তো আসলে মানুষই। তাঁরা ওপর তলার মানুষ। তাঁদের সমাজে নীচুজাতের মানুষের ওঠার অধিকার নেই। ওপর তলার মানু খেয়াল-খুশীমতো নিচুতলার অসহায় মানুষকে চলতে হয়।......মানুষের জীবনে দেবতার অবস্থান, নাম বদলিয়ে, আজও তাই অটুট।

গিলগামেশ দেবতার সমান হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পারেননি। দেবতার সমকক্ষতা অর্জনের জন্য অথবা দেবতাদের মানুষের সমতলে টেনে নামিয়ে আনার জন্য যে অবিরাম শ্রেণী সংগ্রাম মানুষ গোড়া থেকে করে আসছে গিলগামেশে তা সুন্দরভাবে বিবৃত হয়েছে। ব্যক্তির জীবনের মধ্য দিয়ে প্রকৃতি ও মৃত্যুকে জয় করার জন্য মানুষের যে নিরন্তর সংগ্রাম সেই মহা সংগ্রামের কথাই এ কাব্যের মূল সুর। তাই এটি মহাকাব্য।

নাটকের প্রয়োজনের রূপান্তর করতে গিয়ে নাট্যকার কিছু নতুন চরিত্র এবং সংলাপ সংযোজন করেছেন। গিলগামেশের রূপান্তর নিশ্চিতভাবেই কষ্টসাধ্য এবং অভিনন্দনযোগ্য। দীর্ঘ গঠন বাক্য অলংকৃত দীপ্তিমান সংলাপ যথেষ্ট লক্ষ্যাস্থির। এতে নাটকটির সঙ্গে দর্শকদের সম্পর্ক ক্ষুন্ন হওয়ার কারণ নেই, বরং এ চংটি অনেক বেশি অভিবেশ করবে বলে মনে হয়। তবে নাটকের শেষ দিকে এসে এই ভঙ্গিটি ম্যানারিজম-এর দায়ে দুষ্ট হয়েছে। নাট্যকার মতিন খানের আধুনিক জীবনোপলব্ধি প্রশংসনীয়। তাই এ ধরনের একটি মহাকাব্যেও নিপুণ হাতে 'অভিজাতেরা তো জানি নিজেদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার-স্যাপার, যাকে বলে কেলেঙ্কারী. চেপে যেতেই চেষ্টা করে' কিংবা 'মানুষের নিবেদন শুনে দেবতারা.. .... কখনো কিছু করেছে বলে তো মনে পড়ছে না' প্রভৃতি ধরনের সংলাপ একান্ত সুরে বাজিয়ে দিতে পেরেছেন।

কিন্তু নাট্যকার যখন যথেষ্ট গভীর, শোভন, ভারী, সংযত, সহমর্মী শব্দ নিয়ে একের পর এক সংলাপ সাজিয়ে পাঠক বা দর্শকের অন্তর্লোক উন্মোচন করতে সচেষ্ট হন, তখন মন্ত্রীর মুখে ইংরেজী 'প্ল্যান' শব্দটি বা এ ধরনের কিছু টুকরো শব্দ পরিবেশকে পঙ্গু করে দেয়। নাটকের প্রথম দৃশ্যটি আরোপিত বলা যাবে না বরং প্রয়োজনেই এসেছে; তবুও মনে হয় ইচ্ছে করলে এ দৃশ্যের ভাব, সংলাপ, অর্থ অন্যভাবে অন্য দৃশ্যের সঙ্গেও আনা যেতো। তাতে বাড়তি একটি সেটের ঝক্কি কমে যেতো।

'গিলগামেশ' এমন একটি নাটক যার সার্থক প্রযোজনায় সন্দেহ নেই, রসবেত্তা দর্শকদের মনে গেঁথে বসে যাবে; অন্যথায় সামান্য ত্রুটি বা অবজ্ঞা নিয়ে নীরস প্রযোজনায় দর্শকদের ভেতর এ নাটক অত্যধিক বিরক্তির উদ্রেক করবে। **অরুণ চৌধুরী**

রোদহীন বসতি

রবীন্দ্র গোপ

রবীন্দ্র গোপের গল্পগ্রন্থ 'রোদহীন বসতি'তে মোট আটটি গল্প আছে। প্রতিটি গল্পই আকারে বেশ ছোট। গল্পকার ছিটেফোঁটা ঘটনার চিত্র তুলে ধরেছেন। গল্পে গল্প নেই। আছে বিচ্ছিন্ন ঘটনা। আর তাকেই বর্ণনা করেছেন রবীন্দ্র গোপ। গল্পে আশাবাদের চেয়ে নৈরাশ্যবাদই বেশি। শিরশিরে রোমান্টিকতা নেই, প্রেম আছে। আর তার প্রেমরূপ নেয় বিচ্ছিন্নতায়। অর্থাৎ জীবনের সঙ্গে না প্রেম, না সংগ্রাম কোন কিছুকেই মেলাতে পারেননি লেখক। হয়তো এটা তিনি চান না। নায়ক ৩য় পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও গল্পে যেন লেখক নিজের কথাই বলতে চান। এটা এক ধরনের ত্রুটি। ভাষা সাদা-মাটা, কারুকাজ নেই।

'রোদহীন বসতি' গল্পের দুই চরিত্র শিশির ও নাসিম। লেখক তাদের ঠিকনায় রিকশায় ওঠার ঘটনা বর্ণনা করলেন। পুলিশ কর্তৃক আহত জাবেদের ঘটনা বললেন। আর কিছু বললেন না। এটাকে কি গল্প বলবো, না অন্যকিছু? 'পরিধি' গল্পে অফিস ফেরতা সন্দীপেরও একই অবস্থা। 'যদি বিষ্টি হয়' গল্পে তিনি গ্রাম থেকে শহরের দিকে ছুটে আসা এক কৃষক তারকের কথা বলেছেন। গল্পে নদী, স্টেশন আর শহরের বর্ণনার ভেতর তারতম্যকে খুঁজে পাওয়া যায় না।

৬৩ পৃষ্ঠার গল্পগ্রন্থটি প্রকাশ করেছে রুনা প্রকাশনী; দাম: আট টাকা। **মা**

কোটা বুলেটিন

নতুন সরকারী চাকুরেদের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ দেয়ার উদ্দেশ্যে

স্থাপিত হয়েছে কোটা। নবীন কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের সময়, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাধ্যতামূলকভাবে এক মাসের জন্যে পাঠানো হয়। গ্রামের সমস্যা স্বচক্ষে দেখে তাঁরা নিবন্ধ রচনা করেন। প্রধানতঃ এ জাতীয় প্রবন্ধ নিয়েই কোটা বুলিটিন প্রকাশিত হয়।

বর্তমান সংখ্যা (৩ খণ্ড, ৩ সংখ্যা) বিশেষ সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। এতে ছ'জন প্রশিক্ষণার্থীর লেখাসহ মোট ন'টি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে! ঐ ছ'জনকে পাঠানো হয়েছিল সাভার থানায়, যেখানে 'ডাক্তার জাফরউল্লাহর নেতৃত্বে পল্লী উন্নয়নের যে নতুন ধারা প্রবর্তন করার চেষ্টা চলছে সেগুলির ওপর জরিপ চালানোর জন্যে।'

কিন্তু গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র 'কোটা'র বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে কেন? এ সম্পর্কে পত্রিকার সম্পাদক লিখেছেন--'যারা গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র সম্বন্ধে জানেন না বা জানলেও খুব একটা ভাল ধারণা নেই, তারা এ সংখ্যার মাধ্যমে ঐ কেন্দ্রের কার্যকলাপের সাথে ভালভাবে পরিচিত হতে পারবেন। তাছাড়া নিবন্ধগুলো যদি সরকারী কর্মকর্তা, নীতি নির্ধারক ও অন্যান্য-দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাহলে আমরা খুশী হব। কারণ দেশের বৃহত্তর অথচ অবহেলিত জনগোষ্ঠীর কল্যাণের ও মঙ্গলের জন্য গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে গেলে ঐ কেন্দ্রের মত জোর সফলতা না এলেও সরকারী কার্যক্ষেত্রে পরিবর্তন আসবে, নতুন দিক নির্ণয় হবে ও সরকারী কর্মচারীদের মনে সহমর্মিতার ভাব জন্মাবে।'

সাভার গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের বিভিন্ন কার্যক্রম, যেমন—স্বাস্থ্য বীমা, স্বাস্থ্য প্রকল্প, গণপাঠশালা, মহিলা প্রশিক্ষণ কর্মসূচী, কৃষি সম্প্রসারণ কার্যক্রম ইত্যাদির ওপর প্রবন্ধগুলি রচিত হয়েছে। লিখেছেন, নীলুফার বেগম, হাসিনা খাতুন, মৃদুলা ভট্টাচার্য, কামরুল হাসান, জহরুল হক, নাসিম ফেরদৌস, মোঃ জহরুল হক, মোঃ হোসেন ও মোঃ সফিউল্লাহ। গ্রাম উন্নয়ন নিয়ে যারা চিন্তা-ভাবনা করছেন বা গবেষণা করছেন বর্তমান সংখ্যাটি তাদের জন্যে হবে প্রয়োজনীয়। এবং বাংলা ভাষার মাধ্যমে গবেষণা সহায়তা করার ব্যাপারে 'কোটা বুলিটিন' বিশেষ ভূমিকা পালন করবে বলে আমরা মনে করি। বর্তমান সংখ্যার (১১৬ পৃষ্ঠা) দাম পাঁচ টাকা। সম্পাদনা করেছেন নীলুফার বেগম।

মুনতাসীর মামুন

নতুন বইপত্র

বাংলাদেশের প্রবন্ধ

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী সম্পাদিত 'বাংলাদেশের প্রবন্ধ' প্রকাশ করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র। প্রচ্ছদ এঁকেছেন সৈয়দ লুৎফুল হক। পৃষ্ঠা ১২৫, দাম টাকা ১৩। এতে লিখেছেনঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ('একুশ বছরের প্রবন্ধ সাহিত্য'), আবুল কাসেম ফজলুল হক ('বাংলাদেশের প্রবন্ধ ও গবেষণা, কয়েকটি প্রসঙ্গ কিছু মন্তব্য'), মনসুর মুসা ('আমাদের প্রাবন্ধিক চিন্তা') ও সাঈদ-উর রহমান ('বাংলাদেশের প্রবন্ধে প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তা')।

চলচিচত্র চিন্তা

চট্টগ্রামের রেইনবো ফিল্ম সোসাইটি প্রকাশ করেছে আনোয়ার হোসেন পিন্টু সম্পাদিত প্রবন্ধ সংকলন 'চলচিচত্র চিন্তা'। এতে লিখেছেন তপন জ্যোতি বড়ুয়া, কবীর আনোয়ার, শেখ নিয়ামত আলী, আনোয়ার হোসেন পিন্টু (চিত্রনাট্য), আলমগীর ফরিদুল হক, ইকবাল করিম হাসনু ও আনোয়ার হোসেন। এছাড়া আছে কয়েকটি বিদেশী প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রণ। পৃষ্ঠা ৭০, দাম টাকা ৪।

ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন

সম্ভ্রান্ত বংশের সুদর্শন, শিক্ষিত, ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য সুন্দরী, সহজ সরল পাত্রী চাই। সদ্য তোলা ফটোসহ বিস্তারিত লিখুন। গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে। লিখুন।—এ, এইচ চৌধুরী, ডাক বক্স নং-৭১৩, চট্টগ্রাম।

পত্রমিতালী থেকে জীবন সংগিনী। সুমনারা যোগাযোগ করুন।—
Shamim Chowdhury, Beta Company, P. O. Box No-2824, Riyadh, K. S. A.

নিঃসঙ্গ প্রবাস জীবনের একাকীত্বের অবসাদ ঘুচানোর জন্য পত্রমিতালীতে আগ্রহী।—
T. Shabuz/ Sazib, Jassim Bin Khaled Contracting Co, P. O. Box No-1760, Doha, Qatar, Arabian Gulf.

সুন্দর চিঠিগুলোই আমার সান্ত্বনা।—সুজন চৌধুরী, ৮৬, শুর নালাপাড়া, চট্টগ্রাম।

বন্ধুরা "জয় ইঙ্ক" দিয়ে লিখে দেখো—তোমাদের লেখা কত সুন্দর!—পুলক/দুলক।

বিদেশ হতে আমদানীকৃত রেডিও, রঙ্গীন ও সাদা-কালো টেলিভিশন, টেপ রেকর্ডার, রেফ্রিজারেটার, এয়ার কুলার ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম বিক্রয় ও ক্রয় করা হয়।

আপনাদের শুভাগমন আমাদের কাম্য

স্কাইল্যাব ইলেকট্রনিক্স
৪৮, নিউ সুপার মার্কেট,
বায়তুল মোকাররম, ঢাকা-২। ফোনঃ ২৫০১৬৬

মধ্যরাতের অশ্বারোহী

ফয়েজ আহমদ

কিন্তু গাড়ি থাকলেই সে শান্তিতে বাস করা যাবে, এমন কোন কথা নেই। এই কপোতের মতো শান্তিপ্রিয় গাড়িটি দানবের রূপ নিতে পারে। আজকে যে বিদ্যুতের গতিতে চলছে, কালকে সে মৃত হস্তীর মতো স্থবির। যাকে নিয়ে এতো আনন্দ উল্লাস করে যাত্রা করলেন, যাত্রা-বাড়ি পেরিয়েই হয়তো সে গাড়িটি গমনে বৈরাগ্য প্রকাশ করে আপনাকে অশ্রু সমাকুল করে তুলল। এতো কিছু ঝামেলা আর বেদনাদায়ক ঘটনার আশঙ্কার মধ্যেও গাড়ি ছাড়াতো চলা যায় না। সরকার, কলকারখানা, কর্পোরেশন, ব্যাঙ্ক, ইনডেন্টিং ইত্যাদি চলবে কি করে ? তবুও আমাদের দেশে গাড়িযুক্ত ব্যক্তি অর্থাৎ গাড়ির মালিকের সংখ্যা অনুবিক্ষণ যন্ত্র দিয়ে আবিষ্কার করতে হয়। গাড়ির এই কাহাতের মধ্যেও বাঁ হাতের শক্তি যাদের (উভয় পক্ষ লেন দেনে) বেশী তাদের গাড়ি মাথাপিছু দু'টো হতে পারে।

সাংবাদিকদের কিন্তু আপন গাড়ি নেই বললেই চলে। অর্থাৎ অফিসের নয়, নিজের পয়সায় কেনা পাঁচ হাত গড়িয়ে বা রি-কন্ডিশন গাড়ি যে কোন কোন সাংবাদিকের নেই তা নয়। এমন দু'একটি গাড়ির হালও দেখলে বিশ্বাসী ব্যক্তিরা আরোহীর প্রাণ ভিক্ষা করে মানত করতে চাইবে। সাংবাদিকদের মধ্যে এই ধরনের গাড়ি নিয়ে প্রথমে যাত্রা শুরু করেন আমাদের শ্রদ্ধেয় ওয়াহাব ভাই। বর্তমানে বাংলাদেশ প্রেস ইন্সটিটিউটের চেয়ারম্যান জনাব আবদুল ওয়াহাব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্ব থেকেই সাংবাদিকতা শুরু করে এদেশে আসেন বিখ্যাত ইংরেজী দৈনিক কোলকাতার 'স্টেটসম্যান'-এর সংবাদদাতা হিসেবে। তখন থেকেই তিনি সাংবাদিকদের কাছে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ছিলেন।

দেশ স্বাধীন হবার পর সাংবাদিকতায় নানা বিপর্যয় ও বিভিন্ন সংবাদপত্রের দ্বার খোলা ও বন্ধের হিড়িকের এক পর্যায়ে আমাদের ওয়াহাব ভাই মর্নিং নিউজ পত্রিকার সম্পাদক হয়েছিলেন। তাঁর তখনকার গাড়ির কথা বলছি না। তারও প্রায় দু' দশক পূর্বে তাঁর যে গাড়িটি ছিল, তার কথা। ক'হাত পেরিয়ে তাঁর ঘরে শেষ নিঃশ্বাস ফেলার আশা নিয়ে সেই জীর্ণ অথচ অবশ্যই অভিজাত গাড়িটি এসেছিল, তা কি করে বলব। ফ্রান্সের সেই জগত বিখ্যাত মোটর তৈরীর কারখানার ঈশ্বরদের হাতে নির্মিত এই অভিজাত গাড়ি সেত্রোঁ। এ নামটা মুখে আনলেই প্যারিস সুন্দরীদের সেই দুর্নিরীক্ষ্য দেহবল্লরীর চূড়াই

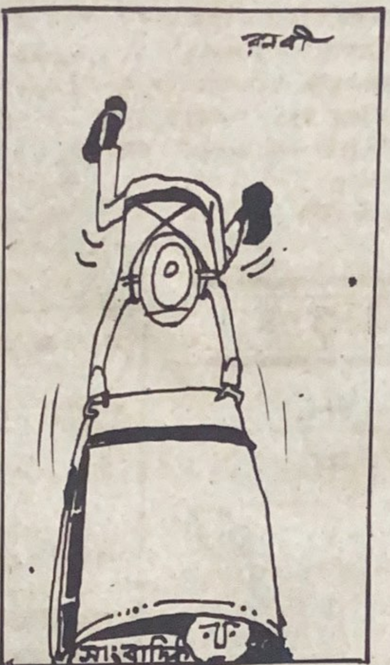

মহামতি মরিস ও অভিজাত সিত্রোঁ।

উৎরাই বক্র রেখার শুক্লতা চোখের সম্মুখে ভেসে উঠতে পারে।

এমন একটা গাড়ির অভিভাবকত্ব মধ্য পঞ্চাশের বুকে ঢাকা শহরে কেবলমাত্র ওয়াহাব ভাই-এরই ছিল—আর অভিজাত বংশজাত এই গাড়িটি তিনি নিজেই চালিয়ে রিপোর্টিং করতেন, ক্লাবে আসতেন। অবশ্য সে সময় এ ধরনের অভিজাত গাড়ি যে ঢাকায় আর কারো ছিল না তা নয়। এই ধরনের 'ন্যাশ'কার। ছিল। মুসলিম লীগ নেতা, যিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বাস করতেন না এবং দেশ স্বাধীন হবার পরও বন্ধু জল্লাদদের সাথে বেশ দীর্ঘ দিন পাকিস্তানেই ছিলেন, আবদুল কাদের সাহেব। জোত জমার মালিক রংপুরের ধনবান মুসলিম লীগ নেতার নামটা তাঁর বন্ধু বান্ধবদের বদৌলতে গাড়ির নামের সাথে মিসে গিয়েছিল—'ন্যাশকাদের।' পুরোনো শহরের সিদ্দিক বাজারের একটা গলিতে গাড়িটা থাকলেও, লাল রঙের গাড়িটার আভিজাত্য ছিল। ওই গাড়ি দেখেই মানুষ তাকে চিনতো। এখনো ঢাকায় কিছু কিছু গাড়ি আছে, যাদের আরোহীকে গাড়ি দেখেই চিনতে হয়—অর্থাৎ গাড়ির গৌরবান্বিত অধিকারী বা আরোহী এসমস্ত ক্ষেত্রে গৌণ।

এছাড়াও ঢাকায় কোন কোন জমিদারের ফোর্ড কোম্পানীর আদি মডেলের গাড়ি ছিল, যে গুলোর হর্ণে সংযুক্ত রাবারের বল টিপে সতর্কবাণী প্রচার করা হতো। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্ব থেকেই রাজনীতির সাথে সম্পর্কিত এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন আইসিএস মামলার সাথে জড়িত রেজয় করীম সায়েবের পরিচিত অভিজাত গাড়িটি অপেক্ষাকৃতভাবে আধুনিক ছিল। তাঁর ছাদ গুটানো গাড়িটও যেন হার মেনে যেতো ওয়াহাব ভাই-এর সেত্রোঁর কাছে।

প্যারিস ক্লাব থেকেই সংগৃহীত অর্থে ধনবান বাংলাদেশের রাজধানীতে গত কিছু দিন যাবত প্যারিসের সেই অস্মিতাপূর্ণ নতুন সেত্রোঁ আপন গৌরবে অবস্থান করছে। ঢাকায় এই সেত্রোঁর আমদানীকারক হচ্ছেন সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত জনৈক বিত্তবান সম্পাদক। সুতরাং বাংলাদেশের সাথে গোড়ার দিক থেকেই সেত্রোঁর যোগসূত্র কোন না কোন ভাবে সাংবাদিকদের মাধ্যমেই। মার্সিডিজের গৌরব ঢাকায় যেন স্তিমিত হয়ে আসছে। অবশ্য সেত্রোঁ-ওয়েভ এখনো ঢাকায় শুরু হয়নি। সরকার হয়তো কমনওয়েলথের সেক্রেটারী জেনারেল রামফালকে বহনের জন্যে মান্ধাতার আমলের গাড়ি নিয়ে বিমান বন্দরে যাবার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি নিতে পারেন। (মিঃ রামফাল ব্যক্তিগত জীবনে 'রোলসরয়েস' ব্যবহার করে থাকেন।) কিন্তু তাই বলে বিভিন্ন দূতাবাসের কমার্শিয়াল কাউন্সিলরদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা বা 'প্রিনসিপ্যাল'দের হোটেল দ্বারে তো আর যেইসেই গাড়ি নিয়ে যাওয়া যায় না। এমন একটা মানসিক প্রস্তুতি অস্বাভাবিক নয়। গাড়ির মানের ভিত্তিতে অনেকে নিজের মান-সম্মানের মানদন্ড নির্ধারণ করে থাকেন। সেটা তাদের অজান্তেই রুজিরোজগারের উর্ধগতির উপর নির্ভর করেই হতে পারে। তা'ছাড়া সামাজিক ও পারিবারিক প্রয়োজনটাও সেক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। এমন অবস্থায় গাড়ির আকার, 'মেক' মূল্য ইত্যাদি সবকিছুর উপর দৃষ্টি রেখেই

চলতে হয়। এই চলার প্রতিযোগিতা বড়ো কঠোর ও সীমাহীন।

একবার একাধারে মস্ত প্রাণ ও সংস্কৃতিবান এক বন্ধু প্রেস ক্লাবে এলো তার হাত বদলের শেষ পালায় কেনা ক্ষুদে গাড়িটি নিয়ে। আমি আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম। তাস ফেলে সেই বিকেলে (আজ থেকে পনের বছর পূর্বে হবে) তার অফিসে মতিঝিলের দিকে চললাম। পুরানা পল্টনের মোড়ে সাঁ সাঁ করে চার-পাঁচটা তুলনামূলক ভাবে বড়ো গাড়ি আমাদের ওভারটেক করল। আমাদের গাড়িটির গতি সাধ্য মতো দ্রুতই ছিল।

পাশে থেকে পরাজিত বন্ধুকে বললাম: বড়ো গাড়িগুলো তোমাকে ছাড়িয়ে গেল।

উত্তর : হুঁ।

বেশ কিছুদিন পর বন্ধু আবার এলেন আমার খোঁজ করতে প্রেস ক্লাবে। এবার তার সাথে যে গাড়িটি সেটা সাড়ে বারো'শ সিসি হবে, মধ্যম আকৃতির। তার সাথে তেমনি বিকেলে মতিঝিলের দিকে চলমান। সেই পল্টনের মোড় পার হতেই সাঁ সাঁ করে চার-পাঁচটা বড়ো গাড়ি আমাদের পেরিয়ে বুলেটের মতো চলে গেল।

পরাজিত ও বিরক্ত বন্ধুকে বললাম: বড়ো গাড়ি গুলো তোমাকে ছাড়িয়ে গেল।

উত্তর : হুঁ।

প্রায় বছর খানেক পর সেই প্রিয়বন্ধু আমাদের ক্লাবে এলো বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিতে। আবার যাত্রা করলাম তার গাড়িতে করে মতিঝিল। তার এবারকার গাড়িটা প্রাইমাউথের মতো বড়ো। যে কোন পরিমাপে এটাকে বৃহৎ গাড়ি বলা চলে। আমরা দুজন আবার পল্টনের মোড় পার হয়ে যাচ্ছি। আবার পাঁচ-ছটা গাড়ি সাঁ সাঁ করে আমাদের গাড়িটা ওভারটেক করল। কি করা যায়! ওগুলো তো দ্রুতগামী নতুন ও সুবৃহৎ।

পরাজিত ও ক্ষুব্ধ বন্ধুকে কোমল স্বরে বললাম : বন্ধু, গাড়িগুলো এবারও তোমাকে ছাড়িয়ে গেল।

উত্তর : হুঁ।

এই নাটকীয় ঘটনা দু'বন্ধুর মধ্যে পর পর একই ভাবে ঘটল।

যেখানে কোন সীমারেখা টেনে দেয়া হয়নি, সেখানে সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার কোন শেষ নেই। সাংবাদিকদের এমন প্রতিযোগিতার প্রশ্নই উঠে না।

শ্রদ্ধেয় ওয়াহাব ভাই এজাতীয় প্রতিযোগিতায় ছিলেন না, কিন্তু আভিজাত্য বোধ থাকা স্বাভাবিক। সাংবাদিক ওয়াহাব ভাই সেই অভিজাত সেভ্রো নিয়ে কম বেদনা ভোগ করেন নি। এই অভাবের দিনে রিকনডিশন ও বসে যাওয়া গাড়ি জনারণ্যে ঠেলে স্টার্ট করতে গিয়ে এখন আর কেউ তেমন লজ্জিত হন না। কিন্তু তখনকার দিনে ঠিক এভাবে গ্রহণ করা হতো না। প্রেস ক্লাবে ওয়াহাব ভাইকে রোজ বিকেলেই সব সময় আসতে হতো দৈনন্দিন খবর তাড়া করে। আমরা তাঁর কাছে জুনিয়র—বয়স ও সাংবাদিকতায়। সন্ধ্যার পর স্বামীবাগের পথে তিনি যাত্রা করলে, আমরা কেউ কেউ তাঁর সাথে নবাবপুর রেল ক্রসিং পর্যন্ত যেতাম। 'সংবাদ'-এর পথ আমি অর্ধেকটা লিফট পেতাম। কিন্তু তৎকালীন লাট ভবনের গেটের সম্মুখে (বর্তমানে বিআরটিসি-র বাস টার্মিনাল) সদা দন্ডায়মান ট্রাফিক পুলিশ বেচারাই সমস্ত গোলযোগের কারণ হয়ে দাঁড়ালো। এ যেন এক বাঁধা ধরা ব্যাপার, যখনই ওয়াহাব ভাই সেভ্রো চড়ে আমাকে নিয়ে এভেন্যু ধরে প্রেস ক্লাব থেকে সেই গেটের কাছে পৌঁছাতেন, তখনই পুলিশ হাত উঠিয়ে দিত।

ব্যাস! সেভ্রো থেমে যেতো। এবং স্থায়ীভাবে। পুলিশ হাত নিম্নমুখী করার সাথে সাথে চারদিক থেকে কর্ণবিদারী হর্ণের মধ্যে রোড ব্লক হয়ে আসে, এখনো যেমন হয়। ঘটনাটা আর কিছুই নয় আমাদের সেভ্রো আর চলে না। হায় বৃদ্ধ সেভ্রো! আমি পেছন থেকে ঠেলতে শুরু করলাম; ওয়াহাব ভাই খুবই সতর্কতার সাথে স্টিয়ারিং-এ। শেষে পুলিশের সাহায্য।

হয়তো আকস্মিক ভাবে গাড়িটা জাম্প করে উঠলো, তারপর বোঁ ছুট। আর তাকে থামাবার সাহস হয় না। কিছু দিন পরে ওয়াহাব ভাই-এর সেই সম্ভ্রান্ত সেভ্রো আর দেখিনি।

কিন্তু সেবার মেজাজী সেভ্রোর হাত থেকে বাঁচতে পেলেও আমি আমার ন্যুব্জ দেহ মরিসের যন্ত্রণা বিবরণ থেকে রেহাই পাইনি। 'চিত্রালী' সিনেমা সাপ্তাহিকের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এস, এম পারভেজ একটা পুরোনো গাড়ি বিক্রি করে দেবে স্থির করেছে। তার ধারনা আমার একটা গাড়ি থাকা দরকার, কারণ ষাটের দশকের গোড়ার দিক থেকেই ঢাকা শহরটা মহানগরীর আকার নিতে চলেছে। বন্ধুরা সহানুভূতির সাথে সাহায্য নিয়ে এসে বলল : হাঁ হাঁ তোর একটা গাড়ি থাকা উচিত। এতো কম পয়সায় কে না গাড়ি চায়।

পাঞ্জাব রেজিমেন্টের এক বাংগালী ডাক্তার সায়েবের এই গাড়ি। এই পঙ্গু গাড়িটা দীর্ঘ দিন 'রোদে পুড়ে জলে ভিজে অবিরত দিনরাত' অবহেলার মধ্যে পড়ে ছিল।

আমি বললাম : ক'টা দরোজা ?

পারভেজ উত্তর দিতে উৎসাহী নয়। শেষে থেমে বলল : দু'দরোজা।

'তবে কেনা গেল না—দু দরোজার গাড়ি কিনে কি করবো ?'

ওর ধারণা আমি চার দরোজার গাড়ি না হলে কিনবো না। একটু থমকে গেল।

তারপর যুক্তি সঞ্চার করে বলল: চার দরোজার গাড়ি দিয়ে আপনি কি করবেন? একা মানুষের দু'দরোজাই তো উপযুক্ত।

আমি এক দরোজার গাড়ি চাইছিলাম, পারভেজ। দ্বিতীয় দরোজায় কেউ না কেউ উঠতে চাইলে তো আর আপত্তি করা যাবে না।'

(এই জাঙ্কটা পরবর্তীকালে পাঁচশ' টাকায় বিক্রি করেছিলাম, ভাঙ্গাই-দের কাছে।)

যা' চেয়েছিলাম, তাই হলো। প্রথমদিনেই সেই মরিস জাতীয় গাড়িটি নিয়ে প্রেস ক্লাবে প্রবেশের সময় অঘটন। অপটু চালকের যা' হয়—গেটের বাঁ দিকের পোস্টের সাথে প্রচন্ড আঘাত, সাথে সাথে দ্বিতীয় দরোজা বন্ধ হয়ে গেল স্থায়ীভাবে। এহেন গাড়ি নিয়ে রিপোর্টিং।

প্যাকেট লাঞ্চ, স্ন্যাকস,
মিষ্টি, দধি ইত্যাদি
সরবরাহ করা হয়।

প্রিন্স রেস্তোরাঁ
Prince
Restaurant
WHERE SERVICE COUNTS

৫৪, স্টেডিয়াম, ঢাকা।
ফোন: ২৩৫৭৭০

পঁচিশে ডিসেম্বর (চৌষট্টি সাল) ঢাকায় প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খাঁ টেলিভিশন স্টেশন উদ্বোধন করতে এলেন। রিপোর্টাররা সবাই জড় হয়েছি প্রেসক্লাবে। বন্ধু হাসানুজ্জামান খান ও রিপোর্টার ফজলুল করীম (বর্তমানে দৈনিক বাংলার নগর সম্পাদক) নিজেরাই স্থির করলেন আমার গাড়িতে ডিআইটি বিল্ডিং-এ যাবেন সেই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে। দু'বন্ধু সাংবাদিককে নিয়ে বলতে হবে নির্বিঘ্নেই গন্তব্য স্থানে পৌঁছালাম! ঝামেলা যতো অনুষ্ঠান শেষে। সন্ধ্যার পর তারা আমার গাড়িতে এসে বসলেন। বঙ্গভবনের সম্মুখ দিয়ে এখন যে নিষিদ্ধ রাজপথ (জনগণের জন্যে) চলে গেছে, সেটা তখন মাটি খুঁড়ে সারাই করা হচ্ছিল। কাদার মধ্য থেকে গাড়িটা তিনজনে উঠিয়ে যাত্রা শুরু করলাম প্রেস ক্লাবের দিকে।

হাসানুজ্জামান ছিলেন পেছনে, আর করীম সাব আমার পাশে। বললামঃ আপনারা যখন আবার এলেন, তবে দু'জনকে দুটো জরুরী কাজে লিপ্ত থাকতে হবে। দু'জনেই আনন্দের সাথে নিজেদের অফার করলেন। (তখনো তাঁদের জানা নেই কি করণীয়!)

'করীম সায়েব, আপনাকে গীয়ার ধরে রাখতে হবে খুব কষে। গীয়ারটা এক থেকে দু'নম্বরে বা তিন নম্বরে দিলেই ফসকে যায় কিনা! মানে এক-এ ফিরে আসে।'

তাঁর মুখ দিয়ে আতঙ্কের একটা শব্দ বেরুলো, অ্যাঁ!

'বন্ধু হাসানুজ্জামান, আপনাকে হেড লাইটের কাজ করতে হবে। এ গাড়ির হেড লাইট জ্বলে না: অন্য গাড়ির লাইটে চলাফেরা করি। তার উপর আমি চোখে দু'সুত কাচের মতো পুরু চশমা এঁটেছি, কিছুই রাতের বেলা দেখি না। মানে আপনি সামনের গাড়ি, লাইট-পোস্ট, ডান-বাঁ বলে দেবেন। হর্ন-টর্ন নেই।'

বন্ধু একটা শব্দাংশ উচ্চারণ করলেন, ত-ত-ত (মানে, তবে কেন উঠালেন!)

'শুনুন, পাঞ্জাব রেজিমেন্টের নম্বর যুক্ত এ গাড়ি কিন্তু যাত্রা করলে থামে না; থামলে ছাড়ে না।'

এমন একটা ভয়াবহ বর্ণনা শুনে ধারালো সাংবাদিকদ্বয় যেন ভয়ে থাম্বা মানে গ্রীক ভাস্কর্যের বিবর্ণ পীলারের মতো হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে মহামতি মরিস আর্তনাদ করে যাত্রা শুরু করেছে। গুলিস্তান ঘুরে যেতে হবে। মোড়ে আসতেই হাসান সায়েব চিৎকার করে উঠলেন বজ্রকণ্ঠে—গাড়ি গাড়ি গাড়ি! বাঁয় বাঁয় বাঁয়! ডান দিকে যাবার কথা, প্রাণ বাঁচাতে বাঁদিকে চললাম, অদূরেই নবাবপুর।

সেই লাট ভবন গেটের মোড়ে আসতেই পুলিশের হাতের নীচ দিয়ে বাঁদিকে ঘুরে গেলাম। কারণ, পুলিশের নির্দেশ মানতে হলে গাড়ি থামাতে হবে এবং সাথে সাথে বেচারা মরিস নিঃপ্রাণ হয়ে পড়বে। পুলিশের ভয়ে গীয়ারের নাম্বার বাড়িয়ে দিলাম। করীম সায়েব দু'হাত দিয়ে চেপে সঠিক অবস্থানে গীয়ার ধরে রাখলেন।

লাট ভবনের পাশ দিয়ে আমাদের অবাধ্য মরিস তিনজন সাংবাদিককে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, জানি না। ইত্তেফাকের মোড়ে পুলিশ ডান দিকে (নারায়ণগঞ্জের পথ!) ব্যারিকেড দিয়েছে। দুরন্ত মরিস সেদিকই মোড় নিল। মন্থরগতির সুযোগে বন্ধু জামান আমার উপর দিয়েই নেমে গেলেন। (দুঃসময়ে সকলেই বন্ধু বটে হয়......) করীম সায়েবের পাশের দরোজা স্থায়ীভাবে বন্ধ, তিনি যাবেন কি ভাবে? তা ছাড়া তিনি গীয়ার নিয়েই ব্যস্ত, ছেড়ে দিলেই দুর্ঘটনার আশঙ্কা। জামান সায়েব চলে যাওয়ায় আমাদের চোখ দুটো, মানে হেড লাইট নিভে গেল।

গাড়ি আমাদের সেভাবেই চলল। রাস্তার দু'পাশের পথচারীদের জানার কথা নয়, আমরা কি বিপদের উপর ভর করে ছুটছি। এবার নারায়ণগঞ্জের পথটা পুলিশের হাতের নির্দেশে বন্ধ, উয়ারীর দিকে খোলা। সুতরাং সেদিকেই যাত্রা অব্যাহত। কিন্তু হরদেও গ্লাস ফ্যাক্টরীর কাছে রেলক্রসিং বন্ধ। উপায়! কারখানার গেটে দুটো অপেক্ষমান রিকশাকে আহত করে আমাদের অন্ধ, গীয়ারহীন, অশীতিপর বৃদ্ধ মহামতি মরিসের যাত্রা সমাপ্ত হলো!

*

এই জাতীয় লঘু ঘটনা, আকণ্ঠ নিমজ্জিত মুদ্রাস্ফীতির যন্ত্রণা, গুপ্ত হত্যার আতঙ্ক, জেল গেটে রুদ্ধদ্বার কক্ষে বিচারের মতো স্বাধীনতা, দেয়ালের দিকে মুখ রেখে বিপ্লবী হত্যা ও 'সাফল্যমণ্ডিত' ক্যু-দে-তায় 'প্রয়োজনীয়' হত্যার খবরাখবর নিয়েই যাদের জীবনযাত্রা, তাদের জীবনে সীমাহীন দুর্ভোগ প্রতিযোগিতা রঙিন স্বপ্ন ছাড়া আর কি হতে পারে?

ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন

জীবন মিতার সন্ধানে।—নুরুল ইসলাম, সানফ্লাওয়ার এন্টারপ্রাইজ, ১৬, সুফিয়া ম্যানসন, সিলেট।

১৬ই মে দুপুরে যার সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ হয়েছিল তাকে সেই নাম্বারে অথবা ২৩০২৭৩ নাম্বারে ১২টা থেকে ১টার মধ্যে যোগাযোগের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।—সেলিম।

তুমি চিঠি দিয়েই দেখো না—উত্তর পাও কিনা?—মাহফুজ/শরীফ, "অবসর", নাটোর, রাজশাহী।

রাঙ্গামাটি মটর্স-এর '৮১ সালের ক্যালেন্ডারের প্রথম পৃষ্ঠার মডেল কন্যাকে আমার অতি পরিচিত মনে হচ্ছে। আপনার সংসাহসের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে লেখার মিনতি করছি।—শাওন, ৬৩২ মহসিন হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

রেনা, তুমিই আমার আকাঙ্ক্ষিত চিরসঙ্গিনী।—নতুন পরিচিত, সিলেট।

রেনা, আমার ভালবাসা শুধু তোমার জন্য।—নতুন পরিচিত, সিলেট।

রেনা, তোমার আনন্দ বার্তাই হবে আমার নিত্যদিনের চলার সঙ্গী।—কাছে এসো।—নতুন পরিচিত, সিলেট।

পাত্রী চাই। ছবিসহ লিখুন। গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে।—Md. Younus Khan, P.o. Box No-793, Basrah, Iraq.

মিতালীতে আগ্রহী।—বাবুল, ২৪ নং পাঁচলাইশ আ/এ, চট্টগ্রাম।

ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন

ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপনের হার প্রতিশব্দ এক টাকা। নগদ মানিঅর্ডার, পোষ্টাল অর্ডার ও ড্রাফটের মাধ্যমে এই হার পরিশোধযোগ্য। প্রয়োজনবোধে বিজ্ঞাপন বাতিল কিংবা ভাষা সংশোধন করা যাবে।—কর্মাধ্যক্ষ, বিচিত্রা, ১নং ডি, আই, টি, এভিনিউ, ঢাকা-২।

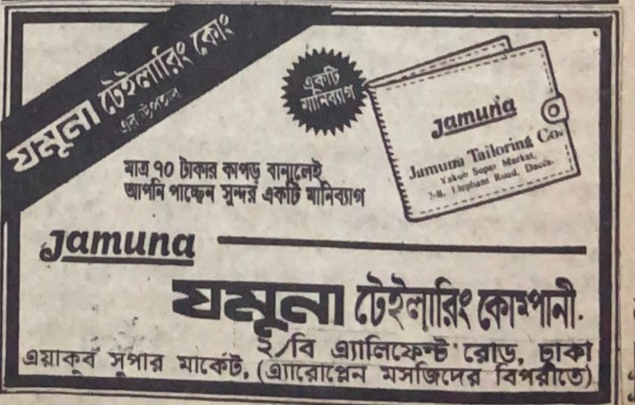

অর্থনীতি সমিতির ভাঙন

১৫ মে '৮১ সংখ্যার বিচিত্রায় 'অর্থনীতি সমিতির ভাঙন' শীর্ষক প্রতিবেদনটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বলা বাহুল্য এ প্রতিবেদনটি একটি সম্পূর্ণ সত্যের আংশিক প্রকাশ মাত্র।

এ কথা সত্য যে সমিতির বিগত কার্যনির্বাহী কমিটির কার্যকলাপে, অনিয়মানুবর্তিতায় আমাদের সকলেরই ক্ষুব্ধ হবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। বিভিন্ন ব্যাপারে সমিতির কর্মকর্তাদের সাংগঠনিক দুর্বলতায় অনেকেই রুষ্ট হয়েছেন। কিন্তু একথাও সত্য যে এ সকল দুর্বলতাকে, বিশৃংখলাকে উপেক্ষা করেও প্রতিটি অধিবেশনেই যথেষ্ট জনসমাগম হয়েছিল।

আপনাদের প্রতিবেদন অনুযায়ী অধিবেশনের বিভিন্ন সভাপতি মন্ডলীর নাম অনেকের বিক্ষোভের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল। কথাটি সত্য নয়। আমার ধারণা, কোন ব্যক্তি বিশেষের প্রচেষ্টা নয় বরং সংগঠনিক কমিটির সুপরিশক্রমেই এই সকল অধিবেশনের সভাপতি মন্ডলীর নাম স্থির হয়। সম্ভবতঃ যাঁরা সভাপতিরূপে নিজেদের নাম দেখতে চেয়েছিলেন, অথচ দেখতে না পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়েছেন—হবার যথেষ্ট কারণও হয়তো বা রয়েছে তাঁরাও নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে সর্ব জনাব প্রফেসর মোশাররফ হোসেন, এ, এফ এ হোসেন তাহেরুল ইসলাম মুজাফফর আহমদ, আখলাকুর রহমান, রেহমান সোবহান ও এম এ হামিদ অবিসংবাদিতভাবে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় অর্থনীতিবিদ। তাই এদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের প্রশ্নটি নিতান্তই ব্যক্তিগত।

এ কথা অনস্বীকার্য, রেজিষ্ট্রেশনের ব্যাপারে, প্রবন্ধ ও ফোল্ডার বিতরণের ব্যাপারে প্রচুর অব্যবস্থা ছিল, অসংগতি ছিল। এ নিয়ে বাকবিতণ্ডায় না গিয়েও বলা যায় যে কিছু কিছু অসংগতি অসুবিধা প্রতিবারই থাকে এবং এ সমিতি ভাঙবার জন্য এ কারণগুলো কিন্তু মোটেই যথেষ্ট নয়।

এবার নির্বাচনের প্রসঙ্গে আসি। সমিতির গঠনতন্ত্রে নির্বাচনের ধারার উল্লেখ থাকলেও তাতে প্রচুর অস্বচ্ছতা ও পদ্ধতিগত ত্রুটি ও অসংগতি আছে। এ সকল ত্রুটি অনুধাবন করে সমিতির সভাপতি প্রথম থেকেই পরিষদকে জানান যে নির্বাচনের ব্যাপারে দু'টি পথ উন্মুক্ত হচ্ছে—(১) একটি আপোষ প্যানেল তৈরী করা (যা প্রতিবারই হয়ে থাকে) এবং (২) ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরঙ্কুশ করতে হলে গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ১ মাস থেকে ৬ সপ্তাহ সময়ের প্রয়োজন। কিভাবে নির্বাচন করতে হবে তা তিনি উপস্থিত পরিষদকে নির্ধারণ করতে বলেন।

সকলের গ্রহণযোগ্য একটি আপোষ প্যানেল তৈরীর উদ্দেশ্যে কয়েক পর্যায়ে সভাকে মুলতবী ঘোষণা করা হলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন, বি,আইডি এসের কতিপয় ও বিআইবিএম এর কয়েকজন একটি অক্ষ দাঁড় করান ও ছাত্রদের ভোটাধিকার দেবার ব্যাপারটিতে সম্পূর্ণ সোচ্চার লবিং চালান।

এক পর্যায়ে সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যকরী কমিটিকে পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও নির্বাচনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা প্রদান করা হয়। এই অধিবেশনে কার্যকরী কমিটি নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত নেয়ঃ

(১) নির্বাচন হবে ব্যালটের মাধ্যমে তা কবে ও কিভাবে তা স্থিরীকৃত করার জন্য একজন নির্বাচন কমিশনার উপস্থিত সাধারণ পরিষদ নির্বাচন করে দেবেন।

(২) শেষদিন পর্যন্ত যাঁরা সদস্য হয়েছেন তাঁরাও ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। এ প্রসংগে গঠনতন্ত্রের সংশ্লিষ্ট ধারাটি শুধু এবারের মতো স্থগিত থাকবে।

(৩) ছাত্রদের ভোটাধিকার না থাকবার ধারাটি আপাততঃ স্থগিত রেখে শুধুমাত্র এবারের মতো ছাত্রদের ভোটাধিকার নেওয়া হোল।

মুলতুবী সভা পুনর্বার মিলিত হ'লে যাঁরা একদা তাৎক্ষণিক নির্বাচন চান, তাঁরাই আবার নির্বাচনকে পিছিয়ে দিতে বলেন ; যাঁরা এতক্ষণ ছাত্রদের ভোটাধিকারের প্রশ্নটিতে প্রথম দিন থেকে সোচ্চার ছিলেন, তাঁরাই ছাত্রদের ব্যবহৃত না হবার নির্দেশ দেন। তাঁদের এই দ্বিমুখী ভূমিকা ছাত্রদের কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়ে ও এ প্রস্তাবটি তৎক্ষণাৎ ছাত্রসমাজ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয় এবং ছাত্ররা তাৎক্ষণিক নির্বাচনের জন্য প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করেন। অবশেষে যাঁরা প্রথম থেকে ছাত্রদের ব্যবহৃত করে নিজস্ব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য চেষ্টা চালান তাঁরা দেখেন যে তাঁদের গৃহীত রণকৌশল বুমেরাং হয়ে তাঁদের জোটের পরাজয়কে অবধারিত করছে। এ সত্যটি অনুধাবন করে কিছু সংখ্যক সদস্য ওয়াক আউট করেন। নির্বাচনে যে কোন দলের অথবা ব্যক্তির জয় পরাজয় আছে এ সত্যটিকে তাঁরা মন থেকে গ্রহণ করতে পারেননি তাই খাওয়া শেষে......... তাঁরা একটি সভায় মিলিত হয়ে একটি পত্রিকায় বিবৃতি দেন যা সমিতির মৃত্যুবাণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বাকী অংশের উপস্থিতিতে নির্বাচন পরদিন সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

পরদিন সারাদিন বি আই ডি এস ভাঙনকে যুক্তিগ্রাহ্য করে তুলতে চাইলেও তা করতে ব্যর্থ হওয়ায় জোড়াতালি দেবার প্রচেষ্টায় আপোষ ফর্মুলা তৈরি হয় কিন্তু তাঁদের এ প্রচেষ্টা সফলকাম হয়নি।

যাঁরা এ সমিতিতে আছেন ও যাঁরা দলছুট সকলেই অত্যন্ত সম্ভাবনাশীল সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব সকলেরই উচিত ছিল যে কোন মূল্যে একটি আপোষ করা।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
একজন সদস্য

ফোনঃ ৩১৪৭৪৬

সু-সংবাদ! সু-সংবাদ!!

* ছেলে মেয়ে নিয়ে সমস্যা?
* কোথায় তাদের রেখে যাবেন?
* লেখাপড়া নিয়ে ভাবছেন?

বিদেশগামী ও প্রবাসী পিতা মাতার জন্য অপূর্ব সুযোগ

ধানমন্ডি চাইল্ড কেয়ার এন্ড টিউটোরিয়াল হোম
১৭, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, সড়ক নং-৬, ঢাকা-৫।

দুর্জন উবাচ

খোন্দকার আলী আশরাফ

কথায় বলে, পিঁপড়ের পাখা গজায় মরণের তরে। কথায় আরও বলে, দোপায়া জন্তুর ভাল করতে নেই। বাংলাদেশের সব আজব কান্ডকারখানা দেখে গুণীজনের পর্বতপ্রমাণ অভিজ্ঞতা নিসৃত এই বচনই মনে পড়ছে। দশ বছর আগে ওদের স্বাধীন করে দেবার পর থেকেই ওদের আচার-ব্যবহার দিকে লক্ষ্য করে আসছি। গোড়াতে দিব্যি ঠিকঠাক ছিল, দিব্যি ভালো মানুষের মতোই হাব-ভাব ছিল। যখন যা হুকুম করতুম, পালন করার জন্য একেবারে এক পায়ে খাড়া হয়ে থাকত। বাদ-প্রতিবাদ নেই, টাঁ ফো নেই। ধমক দিলে রা'টি করত না। আর দাদা বলতে অজ্ঞান। তখন যাদের ক্ষমতায় বসিয়েছিলুম তারা সবাই ছিল ভারত-বন্ধু। বন্ধুত্বের বর্ণ শুধতে, আহা, সে কি, ব্যগ্রতা তাদের। তা সত্ত্বেও সেই আমলেও বদমায়েশী আমাদের সাথে কম করা হয়নি। যে ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশ স্বাধীনতার সংগ্রামে আমোদিত করেছিল তাদের ফেরত পাঠানোর জন্য ভিতরে ভিতরে সে কি পায়তাঁরা। তা বেশ তো, তোমাদের ভালোর জন্যই তো আমরা ওখানে ছিলুম। আর সেই ভালোটা তো আমাদের বাহিনী তোমাদের জন্যে স্বদেশ থেকে করতে পারে। তাই সরে আসতে আপত্তির কিছু ছিল না। বাংলাদেশের বাঁদরামীর সেই তো অশুভ সূচনা। তবে মনে বড় বেশি দুঃখ পেয়েছিলুম যখন সীমান্ত চুক্তির মতো একটা মহান চুক্তি নাকচ করার জন্য উঠে-পড়ে লাগল ওরা। এক বজ্জাত বুড়ো মওলানা ছিল সে ব্যাপারে পালের গোদা। নচ্ছার বুড়োর সেই শয়তানির ফলটা ভালো হয়েছিল? আমাদের মহারানীর স্রেফ চোখের ইঙ্গিতেই তাকে কি নজরবন্দী থাকতে হয়নি দীর্ঘদিন।

আরো থাকতে হত, যদি না, সাম্রাজ্যবাদীদের কোপানলে পড়ে বাংলাদেশের ভারত-বন্ধুদের ক্ষমতার স্বর্গ থেকে বিদায় না নিতে হত।

আসল নষ্টামী শুরু হয়েছে অবশ্য তখন থেকেই। বানরের হাতে খন্তা পড়লে যা হয়, এখানে খোঁচায়, সেখানে ঘা করতে চায়। যে গভীর আবেগে আমরা বাংলাদেশকে স্বাধীনতা এনে দিয়েছিলুম সেই আবেগের মাথায় খোঁচাখুঁচির ব্যবস্থা পাকাপোক্ত হয়েছে তখন থেকেই। ভেবেছিলুম, আমাদের স্নেহাঞ্চলে চিরদিন ওদেরকে ঢেকে রাখব. কিন্তু দেখা গেল যে, ওরা সেই ভালবাসার আঁচলটাই ছিঁড়ে ফালা ফালা করে ফেলতে চাইছে। হায়, একেই কি বলে কৃতজ্ঞতা? একদিন যে তোর মাথায় পরিয়ে ছিল স্বাধীনতার টোপর আজ কি না, তোরা তার মাথায় বাড়ি মারতে চায়। সাধে কি বলে দোপায়া জন্তুর উপকার করতে নেই?

বাংলাদেশের মানুষের অর্থাৎ দোপায়াদের ব্যবহার মহাজনদের ঐ মহাবচনের আরও একটা জাজ্বল্য প্রমাণ।

বাংলাদেশ, এখন খালি খালি আমাদের দোষ অনুসন্ধানে ব্যস্ত। একদিনের উপকারী বন্ধু এখন নন্দঘোষ হয়ে গেছে। এখন শুধু আমাদের দোষটাই ওদের নজর কাড়ে। আর সেদিনের উপকারটা বেমালুম ভুলে বসেছে। আশ্চর্য।

গঙ্গার পানি নিয়ে বেল্লিকের মতো অন্যায় হুলস্থূল শুরু করেছে ওরা। আমরা অনেক চিন্তা-ভাবনা এমনকি গবেষণা করেও কারণটা আবিষ্কার করতে পারিনি। গঙ্গা জলে বাংলাদেশের হিস্যা জন্মাল কি করে আজতক আমরা তাই ভেবে পাচ্ছিনে। গঙ্গা হচ্ছে একমাত্র আমাদেরই মা জননী। আমরা ভারতীয়রা হচ্ছি তার একমাত্র সন্তান। সেই মাকে আমরা অন্যের সন্তানদের হাতে ছেড়ে দিতে পারি? এই সহজ কথাটা কেন ওরা বুঝতে চায় না। তবু, আমরা মহত্ত্বের পরিচয় কি কম দিয়েছি? গঙ্গার সবটা জলই ইচ্ছে করলে আমরা রাখতে পারতুম, শুধু বাংলাদেশের মানুষের ভালোর জন্যে ওদের পদ্মায় অঢেল জল দিয়েছি। কিন্তু ঐ যে, অন্তহীন লোভ। শুধু খাই খাই ভাব। অত জলেও নাকি ওদের চিড়ে ভিজে না। কিন্তু সাফ কথা আমাদের গঙ্গাজল আর আমরা দিতে পারব না, তো তেষ্টায় তোমাদের বুকের ছাতিই ফেটে যাক আর নাই যাক। তবে হ্যা, গঙ্গাজল দিই আর নাই দিই, যদি চাও তো তোমাদের সংগে আবারও গঙ্গাজলের সম্পর্ক পাতাতে রাজী আছি হাজার বার। ছেড়ে দাও গঙ্গাজলের ধান্দাবাজী। যতই হুজ্জত বাধাও, দুনিয়া জুড়ে যতই চিল্লাবাল্লা কর. হাজারটা ফারাক্কা মিছিল বার কর, গঙ্গাজল লাভের আশা ভুলে যাও। পদ্মায় যেটুকু জল আছে তাই নিয়ে, হে বংগবাসী, তুষ্ট থাক। মনে রেখো, গলাবাজী করে, গঙ্গা গঙ্গা করে এক আধখানা কবিতা লিখলেই গঙ্গার জলে দাবি জন্মে না। ফারাক্কার ফোকড় গলে আর এক ছটাক জলও জুটবে না হে। তো ফারাক্কা নিয়ে ফক্কুরী ফাজলামো তো ওরা ছাড়ছেই না. ইদানীং আমরা তাজ্জব হয়ে যাচ্ছি, আমাদের আঞ্চলিক অখণ্ডতার ওপর পর্যন্ত শ্যেন দৃষ্টি হানতে শুরু করেছে। বঙ্গোপসাগরে একটা চর গজিয়েছে। আমরা ওটার নাম দিয়েছি পূর্বাশা। কেন না, ওটা আমাদের সম্পত্তি যে হবেই এটা বহুপূর্ব থেকেই আশা করে আসছি। তো এখন ওরা দ্বীপটার দক্ষিণ তালপট্টি (কি জঘন্য নাম!) নামকরণ করে ওটার উপর মালিকানা দাবি করছে। কি উদ্ভট যুক্তি? যেহেতু কাছাকাছি ওদের একটা উত্তর তালপট্টি দ্বীপ আছে আর

এটার নামও ওরাই দিয়েছে সুতরাং ঐ দ্বীপটাও নাকি ওদের। ভাবটা এই, দ্বীপটার ওরা একটা নাম দিয়েছে বলেই ওটার ওপর ওদের মালিকানা বর্তেছে। তো আমরা আমেরিকার একটা নাম দিলেই কি দেশটা আমাদের হয়ে যাবে নাকি? বলিহারী বাংলাদেশের আক্কেল।

আমাদেরও অবশ্য ভুল হয়েছে মানি। কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশের ধাস্টামো দেখেই আমাদের বেআদপীর সংজ্ঞা নিরূপন করা উচিত ছিল। এতবড় আর মহান দেশ ভারত, ইচ্ছা করলেই তোদের মতো চামচিকাকে কাঁচা গিলে ঢেকুর তুলতে পারে, তাদের সঙ্গে এমন ধারা ইয়ার্কি। অথচ দুনিয়াশুদ্ধ মানুষ জানে যে, এখনো অনেক বাংলাদেশী নেতা সপরিবারে এই ভারতেরটাই খাচ্ছে পরছে, রাজকীয় খাতির পাচ্ছে, আমাদের গবর্নমেন্টের হাওয়া গাড়ী আমাদের গবর্নমেন্টের পয়সাতেই চড়ছে। ফূর্তি লুটছে যেমন খুশি। অতীতের উপকারটার কথা না হয় ছেড়েই দিলুম, ওদের নেতাদের যে এখনো আমরা এমন মেহমানদারী করছি, অন্ততঃ সেই কারণেও আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ওদের গললগ্নীকৃতবাসী হওয়া উচিত ছিল না?

ঘটছে কিন্তু উল্টোটা। সন্ধায়ক আর আন্দামানকে যখন আমরা আমাদের পূর্বাশায় পাঠালুম তখন বাংলাদেশ বলে কিনা 'হঠ যাও ইধারসে। ইয়ে হামারা সম্পত্তি হ্যায়।' আর সেটাও খুব আদব কায়দার সঙ্গে নয়; রীতিমতো অভদ্রভাবে। এ সম্পর্কে আনন্দবাজার পত্রিকা লিখেছেনঃ বাংলাদেশী গানবোটগুলো অত্যন্ত আপত্তিকরভাবে ভারতীয়দের শাসিয়ে গেছে।

হায় ঈশ্বর! কে কাকে শাসায়; ধৃষ্টতার একটা সীমা থাকা উচিত। আমরা অবশ্য থোড়াই পরোয়া করি এসবের। তবু কথা থেকে যায়। ওরা শাসাবে কেন? আর শাসালেও অমন অভদ্রভাবে কেন? ভদ্রভাবে কি শাসানো যায় না? এই প্রসঙ্গে ১৯৭২ সালে মহারাণীর বাংলাদেশ সফরের ঘটনা মনে পড়ছে। নৌভ্রমণকালে যখন দু'দেশের মৈত্রীচুক্তি স্বাক্ষরিত হচ্ছিল তখন তো ভারতীয় নৌ-বাহিনীর ফ্রিগেট মেঘনাবক্ষেই ভাসমান ছিল। কৈ তখন তো কেউ এ নিয়ে হাউমাউ করেনি।

সব দেখেশুনে হেসে কিন্তু গড়িয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে। শুধু সেই মহাজনী বচনই মনে পড়েঃ পিপড়ের পাখা গজায় মরণের তরে। আমরা তা বলে বেশি কিছু করব না। বাংলাদেশের ভারত-বন্ধুদের মদত দিলে ওরাই একদিন গঙ্গার জল আর পূর্বাশার দাবীদার দুরাশা আচ্ছা করে মিটিয়ে দেবে।

(আকাশবাণীর সংবাদ পরিক্রমার জন্য রচিত একটি কথিকা)

ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন

যৌবনটা বেহিসেবী হলেও জীবনটা বেহিসেবী হওয়া ভাল নয়।—নবাব, চাটগাঁ।

যারা বিচিত্রা পড়েন তারা সবাই আমার বন্ধু।—নবাব, জনতা ফটোস্ট্যাট, রিয়াজউদ্দিন বাজার, চাটগাঁ।

শিখা (মুন্সীগঞ্জ), কোথায় কেমন আছো জানতে দিও?—ফজলুর রহমান, মনুমুখ, সিলেট।

মিসেস লরেন (টাঙ্গাইল) দাদাকে দাওয়াত দেবার প্রয়োজন নেই। দূর থেকে আপনাদের দাম্পত্য জীবনের সুখ কামনা করছি।—'মধুদা', পাবনা।

রোজিকে বলছি (ঢাকা), আমার অনুভূতিটুকু তোমার ভাল লেগেছে জেনে নিজেকে সত্যি ধন্য মনে করছি। ঠিকানার অভাবে শেষ পর্যন্ত বিচিত্রার আশ্রয় নিতে হলো। লেখো আবার। অনেক ধন্যবাদ তোমাকে।—মিজানুর রহমান, কুয়েত।

নার্গিস, অফুরন্ত শুভেচ্ছা নিও।—আমজাদ, ভাটিয়ারী।

রিতা (পাবনা), তুমি আমার মনের মিতা। তোমার ছন্দ, সংলাপ, সাবলিল লেখা সত্যি আমাকে ভীষণ আনন্দ দেয়।—তুহিন, কুয়েত।

"আমি জেনে-শুনে বিষ করেছি পান।"—গনি, কাগজ বিতান, ময়মনসিংহ।

শিরীন (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), হয়তো কেউ খুব সহজেই তোমায় পেয়ে যাবে কিন্তু এটুকু নিশ্চিত—আমার মতো মূল্য দেবে না।—কৃষ্ণকান্ত, টায়ার ট্রেডিং, ঢাকা।

সোহাগ, পরবর্তী লাইনটি তুমি জানো না? লাইনটি হচ্ছে, 'মুই তোরে কুচপিয়া'।—লক্ষ্মীটি।

জসিম মল্লিক, শামিম আরা চলে যাচ্ছে, একটা কিছু বল—এখনও সময় আছে!—আলমগীর কবির, বরিশাল।

ভালবাসি—নদী, ফুল, পাখির পালক, মেঘের চাদর—আমার সবুজ যন্ত্রণা।—শিরীন (অবকাশে), ঢাকা।

সালেহ/শিউ, বাস্তবে নন্দিনী নামক কোন মানুষের অস্তিত্ব কি আপনাদের জীবনে আছে?—জসিম মল্লিক।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্র। গ্রীষ্মের বন্ধে সুন্দরমনা মিতাদের লেখা আহবান করছি।—নিবেদক—জন, ১৪, বান্ডেল রোড, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম।

পত্র বান্ধবী থেকে জীবন সংগিনী করবো।—মোহন (ইঞ্জিনিয়ার) কুতবখালী পোস্টঃ ফরিদাবাদ, ঢাকা।

বৈদেশিক মুদ্রা
অপচয় রোধকল্পে
সরকার
প্লাসটিক ফোমশীট
ও
রাবার ফোমশীট
আমদানী বন্ধ করে দিয়েছেন

বিদেশী উন্নতমানের সমতুল্য প্লাস্টিক ফোমশীট যাহা ইভা (EVA) ফোমশীট নামেও পরিচিত এবং রাবার ফোমশীট এখন দেশেই তৈরী হচ্ছে।

আমাদের তৈরী ইভা (EVA) ফোম শীটের
মৌগলি
(গভঃ রেজিস্ট্রিকৃত) হালকা চপ্পল টেঁকসই, আকর্ষণীয়, আরামদায়ক এবং দামেও কম।

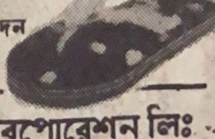

মৌগলি চপ্পল পায়ে দিন
নরম পালকের ছোঁয়া নিন

এ্যাপেক্স ইণ্ডাস্ট্রিয়াল করপোরেশন লিঃ
(প্লাসটিক ডিভিশন)
টঙ্গি, ঢাকা
ঢাকা অফিসঃ ৭৫, দিলখুশা কমার্শিয়াল এরিয়া

৩০ শে জুনের আগেই বীমার প্রিমিয়াম পরিশোধ করে আয়কর রেয়াতের সার্টিফিকেট সংগ্রহ করুন

- আজই একটি নতুন পলিসি নিন, যাতে ৩০শে জুনের আগেই আপনি প্রথম প্রিমিয়াম রশিদ এবং আয়কর রেয়াতের সার্টিফিকেট পেতে পারেন
- সকল বকেয়া প্রিমিয়াম জমা দিয়ে প্রিমিয়াম রশিদ এবং আয়কর রেয়াতের সার্টিফিকেট ৩০শে জুনের আগেই সংগ্রহ করুন
- বীমার টাকা আয়কর মুক্ত এবং প্রদত্ত প্রিমিয়ামের উপরেও আয়কর-রেয়াত পাওয়া যায়

জীবন বীমা কর্পোরেশন

সকল পলিসি রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টিযুক্ত

adbiz

জার্মানীতে বাংলাদেশী চলচ্চিত্র উৎসব

১৩ই মে পশ্চিম জার্মানীর ওয়েস্টফালেন প্রভিন্সের গেলসেনকিরচেন শহরে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র উৎসব শুরু হয়। উল্লেখ্য পশ্চিম জার্মানীতে এই প্রথমবারের মত বাংলাদেশী চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করা হয়। সন্ধ্যা সাড়ে আটটায় গেলসেনকিরচেনের বুর্গার মাইস্টার (মেয়র) অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশী চলচ্চিত্র জগতের খ্যাতনামা পরিচালক আমজাদ হোসেন উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে আমজাদ হোসেন এবং মেয়র উৎসব উপলক্ষ্যে নিজ নিজ বক্তব্য রাখেন। সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর আমজাদ হোসেনের "গোলাপী এখন ট্রেনে" ছবিটি দিয়ে বাংলাদেশী চলচ্চিত্র উৎসব শুরু হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রচুর বাংলাদেশী দর্শক ছাড়াও এদেশীদের সমাবেশ ঘটে। গোলাপী এখন ট্রেনে শুরু হওয়ার আগেই আরো দুটো বাংলা ছবি প্রদর্শিত হয়। ছবি দুটো হচ্ছে 'ডানপিটে ছেলে' এবং 'এখনই সময়।' সবগুলো ছবি দর্শকদের মন কেড়ে নেয়।

আমাদের দেশ আজ দশ বছর স্বাধীনতা লাভ করেছে অথচ এখন পর্যন্ত এখানকার অনেককেই বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানকে বোঝাতে বেশ কষ্ট হয়। এই উৎসব পর্যায়ক্রমে পশ্চিম জার্মানীর সাতটি শহরে অনুষ্ঠিত হবে।

আমাদের তথ্য মন্ত্রণালয়ের উচিত সরকারী পর্যায়ে অথবা যারা বেসরকারীভাবে বিদেশে বাংলাদেশী চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করতে চায় তাদের উৎসাহ দেয়া।

লতিফুর রহমান খান
Overdyker Str-124, 4630, Bochum
West Germany.

বন্দর আব্বাস থেকে

সেদিন রাতের বেলা কাজ থাকায় দিনের বেলা ছিলাম অবসর। অনেকদিন হয় এখানে আছি। কিন্তু বন্দর আব্বাস শহর দেখতে যাওয়া হয়নি। আমি অনেকটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম। ক্যাপ্টেনকে বাসনা জানাতেই রাজী হলো। সকাল নটার সময় যাত্রা শুরু হলো। ঘন্টাখানেকের মধ্যে বন্দারশাহ-এ পৌঁছলাম। (বন্দর শাহ হচ্ছে বন্দর আব্বাস থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে আর একটি বন্দর) ওখান থেকে বাসে চেপে বন্দর আব্বাসের দিকে রওনা হলাম। এখানকার বাসের প্রচন্ড ভীড় বাংলাদেশের কথা মনে করিয়ে দেয়। রাস্তার উভয় পাশেই রয়েছে বসতিহীন খন্ড খন্ড বালুর টিলা। সকালের রোদে বালু মুক্তোর মতো চিকচিক করছে। আমি বাসের জানালায় বসে উপভোগ করছিলাম মরুপ্রান্তর। হঠাৎ কারো ধাক্কায় সম্বিৎ ফিরে পেলাম। বৃদ্ধ রসিক ক্যাপটেন প্রশ্ন করলেন, কি হে বাংলাদেশী একেবারে তন্ময় হয়ে কি দেখছ? একটু সময় নিয়ে বললাম, এখানে নেই পাশ্চাত্যের কৃত্রিমতা, নেই ছায়াঘেরা পাখী ডাকা শ্যামল প্রান্তর। কিন্তু আছে নয়ন মন মুগ্ধ করার মতো মরু প্রান্তর।

এক জায়গায় বাস থেমে গেল। ওখান থেকে ট্যাক্সী নিয়ে গন্তব্যস্থানে পৌঁছলাম। প্রথমে আমাদের এজেন্ট অফিস "সিকলিপারে।" পূর্বেই জানাছিলো আমাদের এজেন্ট অফিসে কয়েকজন বাংলাদেশী কাজ করেন। এদের মধ্যে একজন মহিলাও রয়েছেন। রোকসানা নামের সেই ভদ্রমহিলার সংগে গায়ে পড়ে কথা বলতে হয়েছে, কৌতুহল মেটানোর জন্য।

বন্দর আব্বাস শহরটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর। যদিও পাশ্চাত্যের ছাপ পুরোপুরি পড়েনি। রাস্তাগুলি বেশ প্রশস্ত। প্রত্যেক রাস্তার মোড়ে মোড়েই ইমাম খোমেনীর ছবি টাঙ্গানো। শুধু রাস্তায় নয় অফিস-আদালতে যানবাহনে এমনকি মসজিদেও খোমেনীর ছবি রাখা হয়। এখানকার মুসলমানদের মধ্যে শিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। এখানে হযরত আলী (রাঃ) ছবি দেখে বিস্মিত হয়েছি। আমোদ-প্রমোদের মাধ্যমের মধ্যে শুধু দু'একটা সিনেমা হল চোখে পড়েছে। তাতে বিদেশী কোন ছবি প্রদর্শিত হলেও ফারসী ভাষায় ডাবিং করা থাকে।

Md. Saiful Islam (Rafi)
Deck Cadet
M. V. Hias
C/O. A. Halcussis Co. U. O.
Box No-60, Piraeus, Greece.

রাজকীয় বিয়ে

সম্প্রতি সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্ট শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ানের তৃতীয় পুত্র যুবরাজ শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদের সংগে সংযুক্ত আরব আমিরাতের উপপ্রধানমন্ত্রী শেখ হামদান বিন মোহাম্মদের কন্যার বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে সমস্ত সংযুক্ত আরব আমিরাতের জনগণ, প্রবাসী নাগরিক, এদেশের সকল সরকারী ও বেসরকারী কর্মচারী ও আবুধাবীতে অবস্থিত সকল দেশের রাষ্ট্রদূত নিমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন। বিয়ের প্যান্ডেলটি চারদিকে ২ মাইল বিস্তৃত ছিল এবং প্যান্ডেলটিকে বিভিন্ন রঙের লক্ষ লক্ষ বৈদ্যুতিক বাতি দ্বারা সাজানো হয়েছিল। সাত রাত বাজী পোড়ানোর জন্য ভারত থেকে একদল লোক আনা হয়েছিল। বিভিন্ন আরব দেশ, ভারত ও পাকিস্তান থেকে আনা হয়েছিল ৫শ' শিল্পী। এদের মধ্যে রয়েছে নৃত্য ও কন্ঠ শিল্পীবৃন্দ। তবে এ সমস্ত শিল্পীর পরিবেশিত অনুষ্ঠান সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল না শুধুমাত্র ভিআইপি ছাড়া। বিয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠান আবুধাবীর টেলিভিশনে সম্প্রচারণ করা হয়। এছাড়াও উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে এদেশের বিভিন্ন গোষ্ঠীর নরনারী একসংগে তাদের জাতীয় নৃত্য গান পরিবেশন করে। সংগে ছিল হরেক রকম বাদ্য, বেহালা, ঢোল, ঢাক এবং বাঁশি। অন্যান্য যারা তাদের জাতীয় নৃত্য পরিবেশন করেছিলেন। তারা হলেন, পাকিস্তানী, পাঠান, পাঞ্জাবী, সোমালী, সুদানী ও লেবাননী হুর ও হুয়াইনেরা। মেয়ে-পুরুষ সবাই একই সংগে নৃত্য পরিবেশন করে। এই অনুষ্ঠানে সাতদিনব্যাপী সমাবেশ হয়েছিল লক্ষ লক্ষ জাতীয় ও বিদেশী নাগরিকের। লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশের ফলে যাতে কোন বিশৃংখলা দেখা না দেয় সেজন্য মোতায়েন করা হয়েছিল অসংখ্য পুলিশ।

বিয়েতে আগত অতিথিদের আপ্যায়ন করা হয়েছিল উটের মাংস আর চিকন চালের বিরানী দিয়ে। বিরাট বিরাট একটা ডিশে বিরানী পরিবেশন করা হয়েছিল। একটা ডিশে কমপক্ষে দশজন বসতে পারে। বিরানীর সংগে এক একটা উটের মাংসের ওজন হবে কমপক্ষে ৫ সের। লক্ষ্য করেছি ৬/৭ জনের একটা ডিশে বিরাট একটি উটের মাথা দেয়া হয়েছিল খাওয়ার জন্য কিন্তু এ লোকদের উটের মাথা হাত দিয়ে ভাঙা বা ছেড়া সম্ভব নয় বলে ৬/৭ জন লোক ৬/৭টি পাথর নিয়ে, ডিশের উপর উটের মাথাকে ফেলে পাথর দিয়ে ভাঙছে আর খাচ্ছে; উটের পা-গুলোকে খন্ড-বিখন্ড না করে খুরসহ বিরানীতে দেয়া হয়েছিল।

আগত অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য

একটি ডিশে যে পরিমাণ (আনুমানিক ২০ সের) খাবার দেয়া হয়েছিল তার দু'আনী হয়ত অতিথিরা খেয়েছে এবং বাকী চৌদ্দ আনা পরিত্যক্ত রয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে এই পরিত্যক্ত খাদ্য অপসারণ করে জায়গা পরিস্কারের জন্য মোতায়েন করা হয়েছে মিউনিসিপ্যালিটির শতাধিক ঝাড়ুদার ও ছোট-বড় সমেত ৩০টি আবর্জনার গাড়ি। পানি সরবরাহের জন্য বসানো হয়েছে পানির বিরাট পাইপ লাইন এবং তাতে সংযুক্ত করা হয়েছে অসংখ্য পানির টেপ। বিয়ের এই বিরাট সমাবেশে আমাদের দেশের মত ভ্রাম্যমান হকাররা চিনাবাদাম ও ঠান্ডা পানীয় তুলনামূলকভাবে উচ্চমূল্যে বিক্রয় করে দু'পয়সা কামানোর সুযোগ পেয়েছে।

মাসুক আল-সাকী ও দুলাল
বিদ্যুৎ বিভাগ, বিডিসি, প্রজেক্ট-২
পোস্ট বক্স নং-৩৩২৮
আবুধাবী
সংযুক্ত আরব আমিরাত

কাতারে রবীন্দ্র জয়ন্তী

১৬ই মে প্রবাসী বাংলাদেশী ও পশ্চিমবঙ্গীয়দের যৌথ প্রচেষ্টায় কবি গুরুর ১২০-তম জন্ম জয়ন্তী পালন করা হয়। দু'টি পর্বে বিভক্ত এই অনুষ্ঠান কাতারের বিখ্যাত রামাদা হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে কাতারস্থ ভারত ও বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রদূতদ্বয়সহ আরো অনেক গণ্যমান্য অতিথি উপস্থিত ছিলেন। প্রায় দু'ঘন্টার এই অনুষ্ঠান দর্শকদের খুবই উপভোগ্য হয়।

অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে আবৃত্তি, গীটারে রবীন্দ্র সংগীতের সুর ও রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করা হয়।

দ্বিতীয় পর্বে ছিল "ঋতু রঙ।" বিশ্ব কবির বিভিন্ন ঋতুকে নিয়ে লেখা ১৫ খানা গানের সমন্বয়ে এই ঋতু রঙ নৃত্যনাট্য।

সংগীতে অংশ গ্রহণ করেন সলিল কান্তি বড়ুয়া, প্রবীর গাঙ্গুলী, প্রণয় বড়ুয়া, মিসেস সেলিমা আফজল, শ্রীমতী শুক্লা লাহিড়ী, শ্রীমতী শুক্লা গাঙ্গুলী ও শ্রীমতী সেনগুপ্তা। নৃত্যে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীমতী অম্বীতি বাসু, শুক্লা লাহিড়ী, বলাকা সাহা, শিপ্রারায় চৌধুরী, শুক্লা গাঙ্গুলী, সেনগুপ্তা ও দাস। শিশু শিল্পীদের মধ্যে ছিল ফারিয়া আফজল চান্দ্রী লাহিড়ী ও রূপা কর। ধারা বর্ণনায় ছিলেন—মিসেস কর ও মিঃ ভৌমিক।

অনুষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনায় ছিলেন—ডাঃ মন্ডল, জনাব আলী আফজল, মিঃ লাহিড়ী, মিঃ ভাস্কর মুখার্জী, মিঃ সাহা ও জনাব ইউসুফ।

নৃত্য পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন শ্রীমতী অম্বীতি বাসু এবং সঙ্গীত পরিচালনা করেন সলিল কান্তি বড়ুয়া।

পরিশেষে মহামান্য রাষ্ট্রদূতদ্বয় কবি গুরুর জীবনের উপর আলোকপাত করে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন।

মোঃ হাকিম
মোঃ মুজিবর রহমান
পোঃ বক্স ন-১০০১০, উমসাইদ
স্টেট অব কাতার

কেনাবেচা

সস্তায় আদা

অত্যন্ত আয় সাপেক্ষ। অত্যন্ত দুবিধেজনক। বাটার কোন ঝামেলা নেই। ১০০% বিশুদ্ধ গুড়ো আদা ১ ও ½ পাউন্ডের প্যাকেটে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাচেছ। আজই সংগ্রহ করুন।— মহানগরী সব্জী ঘর, ৫নং সড়ক, ধানমন্ডি—ও ম্যানস প্যারাডাইস, জি—২, নর্থ ডি, আই, টি মার্কেট গুলশান।

সৌন্দর্য পিপাসুদের জন্য

সুখবর

আপনি পুরুষ কিংবা মহিলা যে-ই হোন না কেন,
বি.বি. বিউটি ফাইং মাসল বিল্ডার মেশিন
প্রতিদিন ২০ মিনিট করে ২মাস ব্যবহারেই———

স্টক সীমিত

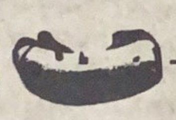

আপনার শরীরের বাড়তি ওজন, মেদ বা স্থুলতা কমিয়ে
ইচ্ছানুযায়ী দৈহিক শ্রীবৃদ্ধি আনয়নে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য।

বহু পরীক্ষিত বিদেশে প্রস্তুত এই
মেশিনের বাংলাদেশে একমাত্র পরিবেশক : ইকনমিক বিল্ডার্স লিঃ

২৭১/১, এলিফেন্ট রোড (দোতলা) ঢাকা-৫
যোগাযোগ : সকাল ৮টা হতে রাত ৯টা, দূরালাপনী : ৩২৫৭২৭

Shyamali

ডানে, ফ্রানজ বেকেনবাওয়ার কসমস দলের হয়ে খেলছেন। বলের জন্য তাঁর সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ডাল্লাস টর্নাডো'র ওমর গোমেজ।

বেকেন বাওয়ারের প্রত্যাবর্তন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কসমস ক্লাবের হয়ে তিন বছরের প্রবাস থেকে ফিরে এলো ফ্রানজ বেকেন বাওয়ারকে যে সংবর্ধনা জানানো হয়, তার একটি ব্যানারে লেখা ছিল 'কিং কেগান ইজ ডেড—লঙ লিভ কাইজার।' এ থেকেই সহজেই অনুমেয় ফুটবলে তাঁর স্থান কোথায়, তাঁর জনপ্রিয়তা কেমন। বলা হয়ে থাকে বেকেন বাওয়ারের ক্যারিয়ার এতো বিজয় মুকুট পরেছে। তা অন্য কোন ফুটবলারের পক্ষে আজো অসম্ভব কল্পনা। তাঁকে বলা হয় ফুটবলের জীবন্ত কিংবদন্তি।

তিনি তাঁর দেশ পশ্চিম জার্মেনীর জন্য একশয়েরও বেশী জয় এনেছেন। ১৯৭৪ সালে ওয়ার্ল্ড কাপে অংশ নেন হল্যান্ডের বিরুদ্ধে মিউনিখে। এতে. ২—১ গোলে জয়ী। ১৯৭২ সালে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ৩—০ গোলে বিজয়, করেন ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিয়নশীপ কাপ। এছাড়াও ওয়ার্ল্ড ক্লাব কাপ, চ্যাম্পিয়নস কাপ উইনার্স কাপে তার অংশগ্রহণ স্মরণীয়।

তিনি গেল বছরের নবেম্বরে হামবুর্গে খেলার জন্য পশ্চিম জার্মেনী ফিরেছেন। তার ফুটবল ক্যারিয়ার সম্পর্কে বলা হয়েছে, কেউ তার রেকর্ড ভাঙতে পারেনি। এমনকি বিশ্বনন্দিত পেলে স্পর্শ করতে পারেননি তার উত্তুংগ সাফল্য। ডি স্টেফানো পুসকাস, ববি চার্লটন লেভ ইয়াছিন কিংবা যোয়ান ক্রাইফ কারো নেই এমন খ্যাতি বা রেকর্ড,

বর্তমান সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হয় ওয়ার্ল্ড সকার ইন্টারন্যাশনাল পত্রিকায়।

কেন এই প্রত্যাবর্তন

নানা কারণ রয়েছে এর পেছনে। একটা কারণ হলো, বলা যায় এটাই অন্যতম, আমি ইউরোপীয়ান ফুটবলের সেই পরিবেশ হারিয়ে আবার ফিরে পেতে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলাম। অন্য কারণগুলোর একটা হলো সিনথেটিক পিচের খেলার অভিজ্ঞতায় আমার ঢের হয়েছে, বলা যায় একঘেঁয়ে হয়ে পড়েছে। তাই আমি সত্যিকারের টার্ফে খেলার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিলাম। ফিরে আসার পেছনে আরেকটা প্রধান ঘটনা হলো, আমি বিশ্বাস করি না যে সত্যি সত্যিই আমার ক্যারিয়ার শেষ হয়ে গিয়েছে।

লোকে বলছে যে অর্থনৈতিক কারণেই এই প্রত্যাবর্তন?

এসব কথার পেছনে কোন যুক্তি নেই। যদি তাই হতো, তবে তো আমি আরো দুই বা তিন বছর যুক্তরাষ্ট্রে থেকে যেতে পারতাম। এখন হামবুর্গে যা পাবো তার চেয়ে দ্বিগুণ অর্থ আয় হতো

আমার।

কসমস-এ যোগ দেয়ায় কি অনুতপ্ত?

নাহ, কোনভাবেই আমি অনুতপ্ত নই। সত্যি বলতে কি আমি ভাগ্যবান যে আমি কসমস-এ যোগ দিতে পেরেছি। আর সে সময় আমার যাওয়া অর্থাৎ কসমসে যোগ দেয়া ছাড়া ভিন্ন কোন পথ খোলা ছিলো না। প্রথমতঃ কসমস যে পাহাড় পরিমাণ টাকা দেয়ার প্রস্তাব করেছিল তা প্রত্যাখ্যান করলে কখনো নিখুঁত পেশাদারী ফুটবলার হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হতো না। অন্যদিকে, সে সময় জার্মেনীতে আমি নিদারুণ অর্থ সঙ্কটে ভুগছি, আয়কর বিভাগ আমাকে বিব্রত করছে। এছাড়াও স্ত্রীকে নিয়েও আমার সমস্যা ছিল। তখন ভাবলাম যুক্তরাষ্ট্রে গেলে সব সমস্যার পুরোপুরি সমাধান না হলেও, অনেকাংশে লাঘব হবে। একজন ব্যক্তি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রভূত সম্মান, অর্থ দুই অর্জন করেছি। কিন্তু একজন ফুটবলের দৃষ্টিতে বিচার করলে বলতে হয়, যুক্তরাষ্ট্রে যে সময় ব্যয় করেছি আমি সে সময়টায় একজনকে ভুলে যাওয়ার জনাই যথেষ্ট। কিন্তু যেভাবে আমি বেড়ে উঠেছি; যেন মিউনিখের সব কিছুই তৈরী হয়েছে আমার জন্য—আর আমাকে এজন্য যা করতে হবে তা হলো কেবল ফুটবল খেলা। আর যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকালে আমার সমস্ত কিছুই বিনিয়োগ করতে হয়েছে। এটা ঘটেছে, আমি যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছি বলে নয়, প্রকৃত কারণ হলো এটা ভিন্ন দেশে বসবাস করার কার্যক্রম।

যখন ভিন্ন দেশের কথাই বলা হচ্ছে তখন বলতে হয় অনেকগুলো ফরাসী ক্লাব আপনাকে পেতে আগ্রহী ছিল, তারা আপনাকে ইউরোপে ফিরিয়ে নিয়ে আনতে পারতো, তাহলে আপনার উপর এতো চাপও পড়তো না। কিন্তু তা না হয়ে বুন্ডেসলিগায় ফিরে এলেন কেন?

না ঘরকা না ঘাটকা হয়ে থাকার মানসিকতা আমার ছিল না। আমি চাইছিলাম যাই করবো তা পুরোপুরি, আধাআধি কোনটাই নয়। যদি আমি ফরাসী ক্লাবের হয়ে ইউরোপে ফিরে আসতাম তা হলে কি লাভ হতো? সেই একই প্রবাস জীবন। আরো বিসদৃশ হতো; ইউরোপে ফিরেছি এতোদিন পর অথচ খেলছি ভিন্নদেশের হয়ে। আমি পুরোপুরি এক পথে চলতে চেয়েছি বলেই জার্মেনীতে ফিরেছি। দু'নৌকায় পা দেয়া আমি সমর্থন করি না।

হামবুর্গ কিভাবে আপনাকে দলে গেল?

ঘটনার শুরু গত ক্রিসমাস

দীর্ঘ ৪৪ বৎসরাধিকাল রিসার্চ ও অবিরাম চিকিৎসা সাধনায় অভিজ্ঞ

সর্বপ্রকার জটিল যৌন ব্যাধি

বাত ব্যাধি, গ্যাস্ট্রিক, আলসার, ক্যানসার, চর্ম্মরোগ, স্ত্রী-লোকের প্রদর, বাধক ইত্যাদি রোগের ইউনানী মতে চিকিৎসার জন্য আপনাকে দেবে সম্পূর্ণ

আরোগ্য লাভের গ্যারান্টি

হাকিমী ঔষধালয়

- ৪৪/১ রামকৃষ্ণ মিশন রোড, গোপীবাগ ঢাকা-৩, ফোন। ২৩৩৭১৮/২৫২৮২৬
- ১৮৩, জুবিলী রোড চট্টগ্রাম, ফোন: ২০১৫০১
- মোগলটুলী রোড, কুমিল্লা। ফোন:- ৬৩৬৬/৩৪০/৬০১৫

STUDY – THE EASY WAY

কিভাবে ভাল ছাত্র হওয়া যায়

ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে এম.এ ক্লাশ পর্যন্ত সব ধরনের ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য একটি

অতি প্রয়োজনীয় বই

বিদ্যুৎ মিত্রের

সঠিক নিয়মে

লেখা পড়া

মূল্য বার টাকা

সেগুন বাগান প্রকাশনী
১১০ সেগুন বাগান
ঢাকা ২

সেবা প্রকাশনী

নিউটস্থ বুকস্টলে আজই খোঁজ করুন।

প্রেসিডেন্ট কাপের বিজয়ী ও রানার্স আপ দলের অধিনায়কের সঙ্গে

থেকে। তখন ডরটমান্ডে বিশ্ব একাদশ ইউনিসেফ ফান্ডে তহবিল তোলার জন্য খেলছে। সেদিন ডিনারের পর আমি গুন্টার নেৎজার ও ব্রাংকো জেবেক-এর পাশে বসা ছিলাম। তাঁরা দু'জন হামবুর্গ দলের যথাক্রমে ম্যানেজার ও কোচ। এখানে বলে রাখা ভাল, এক সময়ে গুন্টার পশ্চিম জার্মেনীতে ছিলেন আমার সহযোগী খেলোয়াড়, আর ব্রাংকো আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, অন্যদিকে বেশ কয় বছর তিনি ছিলেন আমাদের দল বায়ার্ন মিউনিখের কোচ। আমরা ওখানে বসে যখন গল্প গুজব করছিলাম তখন একসময় গুন্টার বললেন, ফ্রানজ তোমার জন্য আমাদের একটা প্রস্তাব রয়েছে। তুমি হামবুর্গ দলের হয়ে খেলতে চলে আস না কেন? আমার মনে হয় আমরা যে অঙ্কের অর্থ প্রস্তাব করবো তা' নগণ্য হবে না।

সিদ্ধান্ত নিতে আপনাকে কি বেগ পেতে হয়েছিল?

সাংঘাতিক। আমার অবস্থা তখন শোচনীয় হয়ে পড়ে। এমন হয়েছে আমি অনেক চিন্তা-ভাবনা করে শেষ পর্যন্ত এক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, আবার একঘন্টা পরেই আমার সব চিন্তা-ভাবনা ও সিদ্ধান্ত চলে গেছে ভিন্ন মেরুতে। তখন রাতে ঘুমাতে পারতাম না। দুঃশ্চিন্তা বা অত্যধিক ও নানামুখী চিন্তা আমাকে তখন ভালো করেই পেয়ে বসেছে। রীতিমতো ভয় পেয়ে গেলাম। শেষে অন্যদের মতামতের প্রার্থী লাম, ডজনখানেক পরিচিতদের লাম একথা, এ বিষয়ে তাদের তব্য শুনতে চাইলাম। আর জকে যে আমি হামবুর্গ এসেছি ই সিদ্ধান্ত নিতে—নেৎজার দিন আমন্ত্রণ জানিয়েছিল তার- র ছ'মাসেরও বেশি সময় লেগেছে ল।

আপনি কি মনে করেন, পুরো ন বছরের দীর্ঘ সময় অনুপ- ত থাকার পর সত্যি সত্যিই পনি বুন্ডেসলিগার ছন্দে র তাল মিলাতে পারবেন?

দি ভাবতাম বা একবারও মনে তাম আমি পারবো না, তাহলে কোনভাবেই কসমস ছাড়তাম না। এটা জলবত তরলং। কিন্তু একটা কথা মনে রাখা দরকার, নর্থ আমেরিকান সকার লীগের তিন বছরের সঙ্গে পশ্চিম জার্মান লীগের তিন বছরে তফাৎ অনেক। প্রথমতঃ যুক্তরাষ্ট্রে গরমের সময় বেশীরভাগ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। সে কারণে তাপমাত্রা অত্যধিক বলে খেলার গতি থাকে মন্থর। আর সেখানে ফুটবল সীজনের পরিধি দীর্ঘায়িত। সুতরাং আমরা খেলার ফাঁকে ফাঁকে বিশ্রাম পেয়েছি প্রচুর সময়ের। এভাবে আমাদের উপর যে শারীরিক চাপ পড়তো তা দূর করা যেত, আহত হলে সম্পূর্ণ আরোগ্য হওয়ার সময় পাওয়া যেত। সব মিলিয়ে তাই আমি বলতে পারি আমাকে তেমন শারীরিক চাপ সহ্য করতে হয়নি যা কিংবা যে ভার এই ৩৫ বছর বয়সের একজন ইউরোপীয় ফুটবলারের শরীরকে বহন করতে হয়।

তিন বছর পর ফিরে এসে আপনি কি জার্মান লীগ বুন্ডেসলিগায় কোন পরিবর্তন দেখতে পাচেছন?

মনে হলো গতি বেড়েছে, আগের চেয়ে খেলায় শক্তি ও শ্রম প্রয়োগের দক্ষতা, কৌশল আরো হিসেবী, মাপা ও নিখুঁত। আমার মনে হয় বর্তমানে জার্মান লীগের গোপন কথাটি হলো বা মূলশক্তি বলা যায়, যে প্রতিটি টিমই ৯০ মিনিট খেলার কিংবা খেলার ৯০ মিনিটের সবসময় পুরো দম নিয়ে বেগবান থাকতে সক্ষম। এখানে ফরাসীদের ও তাঁদের টিমগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখুন। ওদের দক্ষতা ও কৌশল অতি উন্নতমানের, বলা যায় তুলনাহীন। কিন্তু স্ট্যামিনার কথা আসলেই দেখা যাবে ওদের কোন টিমই যেন এক ঘন্টার বেশী ম্যাচ খেলতে অক্ষম। অবশ্য এর মধ্যে ব্যতিক্রম আছে।

তিন বছরের অভিজ্ঞতায় নর্থ আমেরিকান সকার লীগের উন্নতি প্রসঙ্গে আপনার মন্তব্য কি?

পেলে ওদেশে যাওয়ার পাঁচ বছরে, আর তিন বছর এসব মিলিয়ে বলা যায় এ খেলাটি ওখানে জনপ্রিয় হচ্ছে। আগে যেখানে কসমসের খেলায় গড়ে তিন শয়ের বেশী দর্শক হতো না, সেখানে বর্তমানে দর্শক সংখ্যা অনায়াসেই ষাট হাজারে দাঁড়ায়।

আপনি কি মনে করেন পরবর্তী দশকে আমেরিকানদের বিশ্বকাপ জয়ের সম্ভাবনা আছে?

এব্যাপারে আমি যথেষ্ট সন্দেহ প্রবণ।

অনুবাদঃ আলমগীর রহমান

এখানে-সেখানে

ভূমিকা

এক সময় ওয়াশিংটনের বিলুপ্ত সান্ধ্য দৈনিক 'টাইমস-হেরাল্ডের' চিত্রগ্রাহিকা ছিলেন জ্যাকুলিন কেনেডি ওনাসিস; আর 'লাইফ' পত্রিকার চিত্রগ্রাহিকা ছিলেন মার্গারেট বুর্ক-হোয়াইট। নির্মীয়মান দু'টি ছবিতে এ'দের চরিত্রে রূপ দিয়েছেন যথাক্রমে 'চার্লিস অ্যাঞ্জেলস' খ্যাত জ্যেকলিন স্মিথ, ৩২, (ওপরের ছবি) এবং ক্যান্ডিস বার্জেন, ৩৫, (নিচের

ছবি)। প্রথমটি টিভি-ছবি, নাম জ্যাকুলিন বভীর কেনেডী'; অন্যটি রিচার্ড আটেনবরো পরিচালিত 'গান্ধী'।

আত্মহত্যা

চট্টগ্রাম, ২০শে মে।—গতরাতে স্থানীয় একটি হোটেলে শফিকুর আলম ওরফে লাল নামে এক ব্যক্তি বিষপানে আত্মহত্যা করেছে। হোটেল ম্যানেজারের উদ্দেশ্যে রেখে যাওয়া এক পত্রে সে জানায় যে সে তার নিজ দায়িত্বে আত্মহত্যা করছে।

ঢাকার বাসিন্দা শফিকুল আলমকে কয়েক মাস আগে তার স্ত্রী তালাক দেয়। এজন্য সে একবার ঢাকায়ও আত্মহত্যার চেষ্টা করে।

সংবর্ধনা

পোল্যান্ডের শ্রমিক নেতা লেখ বালেসা জাপান সফরে গিয়ে সংবর্ধনা পেয়েছেন চিত্রতারকাদের

মতোই। মেয়েরা ঘিরে ধরেছে, গানের আসর বসিয়েছে পপ তারকারা। জাপানী শ্রমিক নেতাদের সংগে লাঞ্চ খেতে বসে চপস্টিকও ব্যবহার করতে চেয়েছেন, কিন্তু নাকাল হওয়া ছাড়া উপায় কি? (ছবি)।

প্রচার অভিযান

ধূমপান-বিরোধী প্রচার অভিযানে শামিল হয়েছেন মার্কিন চিত্রজগতের কিশোরী যৌন-

প্রতীক ব্রুক শীল্ডসও। এ-সম্পর্কিত একটি পোস্টারে মডেল হয়েছেন তিনি (ছবি)। পোস্টারের শ্লোগান হচ্ছে 'স্মোকিং স্পয়েলস ইয়োর লুকস'।

নতুন ধরনের মানচিত্র

সোভিয়েত ভূগোলবিদ ও আবহ বিজ্ঞানীরা নৌ চলাচলের জন্যে আটলান্টিকের সবচেয়ে মারাত্মক বিপদ সংকুল অঞ্চলগুলোর এক মানচিত্র তৈরি করেছেন। বিশ্বে এটাই ঐ অঞ্চলের প্রথম মানচিত্র। মানচিত্রে উত্তর আটলান্টিককেও দেখানো হয়েছে। এখানে আছে সবচেয়ে বাস্তুতন্ত্র রুটগুলো। ১৬০০ সোভিয়েত জাহাজের নাবিক ও বিজ্ঞানীরা এসব অঞ্চলের আবহাওয়া স্রোত তুষারের অবস্থা এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য পেয়েছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন, ও নেদারল্যান্ড থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন উপাত্ত এবং অতীতকালের বিখ্যাত নাবিকদের রেখে-যাওয়া বিভিন্ন তথ্য এই মানচিত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা প্রশান্ত মহাসাগরের অনুরূপ একটি মানচিত্র তৈরির কাজে বর্তমানে নিয়োজিত রয়েছেন।

শকুনের মৃত্যু

সাপের কামড়ে রংপুর শহরের মুন্সীপাড়ায় একটি গরু সংগে সংগে মারা যায়। শহরের অদূরে গরুটিকে ফেলে দিয়ে আসার পর এক ঝাঁক শকুন মরা গরুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঐ গোস্ত খেয়ে ৪০টি শকুন মারা যায়।

বাল্যবিবাহ

ভারতের রাজস্থান রাজ্যের খনি দফতরের প্রতিমন্ত্রী মিঃ নানা লালের বিরুদ্ধে বাল্যবিবাহ নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী রাজ্য পুলিশ একটি মামলা দায়ের করেছে। গত ১৭ মে উদয়পুর জেলার কুয়াজ গ্রামে মন্ত্রীর দু'জন নাবালিকা কন্যার বিয়ে দেয়া হয়।

অতএব

হোয়াইট হাউজের প্রেসিডেন্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট এলিজাবেথ হানফোর্ড ডোল (৪৪) সম্প্রতি বলেছেন, 'প্রেসিডেন্ট চান না তাঁর চারপাশে থাকুন জবী হুজুরের দল। অতএব তিনি যখন বলেন না, তখন আমরা সবাই বলি না।"

কৃপা

থাইওয়ানের সংগীতজগতের সুপারস্টার তেরেসা ত্যাং (ছবি) সরকারী কৃপা লাভের চেষ্টা করছেন। তবে নিজের জন্যে নয়, পপ গায়ক কাও লিংফাং-এর জন্যে। কাও-এর খোলাখুলি ভাষার গানগুলোকে নৈতিকতা বিরোধী আখ্যায়িত ক'রে তাঁর ওপর কড়া সেন্সর ব্যবস্থা আরোপ করা হয়েছে। ত্যাং উদযোগ নিয়েছেন তাঁর এই দুর্নাম ঘোচাবার জন্যেই।

চলচ্চিত্র

শিশু চলচ্চিত্র 'দস্যি ছেলে'র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট জিয়া

চিত্র সাংবাদিকতায় মহিলা

কিছুদিন আগে অঞ্জনা রহমান পত্রিকান্তরে বলেছিলেনঃ কেবল পুরুষ নয় চিত্র সাংবাদিকদের মাঝে দু'চারজন মহিলাও থাকা উচিত। থাকলে বিশেষতঃ নায়িকাদের জন্যে ভালো হতো। আমরা সহজে তাদের সংগে মিশতে পারতাম। ক্যারিয়ার গড়ার নানা সমস্যার কথা বলতে পারলাম। অঞ্জনার এই উপলব্ধি বাস্তবিকই সত্য। পৃথিবীর অনেক দেশেই পুরুষ সাংবাদিকদের পাশাপাশি মহিলারাও চিত্র সাংবাদিকতায় স্থান করে নিয়েছেন। অনেকের ক্ষুরধার লেখনীর কাছে তো জাঁদরেল অভিনেতা-প্রযোজক নির্মাতাকেও হিমসিম খেতে হয়। এ প্রসংগে উল্লেখ করা যায় আমেরিকার বিশিষ্ট মহিলা চিত্র সাংবাদিক-সমালোচক পলিন কেলের নাম। পোলিশ বংশোদ্ভূত সানফ্রানসিস্কোর এই মহিলা সাংবাদিকের লেখা ও সমালোচনাকে 'দ্য টাইমস লিটারেরী সাপ্লিমেন্ট' একবার জর্জ বার্ণাড শ'র লেখার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। তিনি বেতার, টিভি এবং পত্রিকায় চিত্র সমালোচনা করে মুভি মুগলদের আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছেন। 'সিটি লাইটস', 'দ্য অ্যাটলান্টিক', 'দ্য নিউ রিপাবলিক', 'ভোগ' ম্যাককলস', 'দ্য নিউ ইয়র্কার' ইত্যাদি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লিখেছেন। তাঁর লেখা সমালোচনা নিয়ে একটি বইও বেরিয়েছে 'আই লস্ট অ্যাট দ্য মুভিজ' নামে। ভারতের ফিল্ম ওয়ার্ল্ড" পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক হচ্ছেন একজন মহিলা। তাঁর নাম নীনা অরোরা। এই পত্রিকায়ই আছেন আরেকজন মহিলা চিত্র সাংবাদিক রাধা রামচন্দ্রন। অনীতা মল্লিক নামে আরেকজন মহিলা চিত্র সাংবাদিক আছেন বোম্বেতে। পুরুষ শাসিত বোম্বে চিত্র জগতে মহিলা চিত্র সাংবাদিক দেবযানীকে নিয়ে অনেক অঘটনও ঘটে গেছে। বিদেশী মহিলা চিত্র সাংবাদিকরা নির্দ্বিধায় কাজ করছেন স্টুডিওতে, চিত্র উৎসবে, আউটডোর লোকেশনে, তীক্ষ্ন প্রশ্নবানে জর্জরিত করছেন তারকাদের।

আমাদের এখানে তেমন সাহসী, প্রভাবশালী চিত্র সাংবাদিক নেই। এটা শুনতে রূঢ় হলেও একেবারে অস্বীকার করা যায় না। আমাদের এখানকার সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিই বোধহয় এজন্যে দায়ী। তবু এর মধ্যে কিছু মহিলা চিত্র সাংবাদিকতায় জড়িত রয়েছেন নানাভাবে, কেউ পত্রিকা প্রকাশনার সঙ্গে কেউ সম্পাদনার সঙ্গে, কেউ ফ্রিল্যান্সার হিসেবে, কেউ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রতিবেদনের সঙ্গে। রেবেকা আখতার বানু নামে একজন মহিলা চিত্র সাংবাদিকের কথা জানা যায় যিনি বিভাগ পূর্ব কলকাতার সাপ্তাহিক বেগম, পত্রিকার চলচ্চিত্র বিষয়ে নিয়মিত লিখতেন। পরে এই পত্রিকায় চলচ্চিত্র বিষয়ে লেখেন হুসনা বানু খানম। তিনি অনেকদিন ধরে পত্রিকার এই বিভাগের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। হুসনা বানু খানম 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতি'র একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্যাও। লায়লা সামাদের

নামও উচ্চারিত হয় চিত্র সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে। তিনি পাকিস্তান আমলে প্রকাশিত বর্ণাঢ্য পাক্ষিক 'চিত্রিতা'র সম্পাদিকা ছিলেন। এখন তিনি একটি সাপ্তাহিকে 'রূপ চর্চা' নিয়ে কলাম লিখছেন। পঞ্চাশ দশকে প্রকাশিত ফজলুল হক সম্পাদিত মাসিক সিনেমা'র প্রধান পৃষ্ঠপোষিকা ছিলেন নাসিমবানু আর এর সম্পাদক মন্ডলীতে ছিলেন জেব-উন-নেসা খানম। লেখিকা রাবেয়া খাতুনও জড়িত ছিলেন এই পত্রিকাটির সংগে। সত্তর দশকের শেষ দিকে প্রকাশিত মাসিক 'সমীপেষু'র সম্পাদিকা ছিলেন ফওজিয়া সাত্তার। 'নূপুর' নামে আরেকটি পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন মনি মোস্তফা। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতির সদস্যা শাহানা ফেরদৌস অনেকদিন ধরে 'ঝিনুক' পত্রিকার সঙ্গে জড়িত রয়েছেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর 'রং বেরং' নামে একটি চিত্র-মাসিক বের হয়। স্বল্পায়ু এই মাসিকটির দুই সম্পাদকের একজন ছিলেন চরিত্রাভিনেত্রী মঞ্জুশ্রী বিশ্বাস। মহিলা চিত্র সাংবাদিকদের মধ্যে আরেকজন হচ্ছেন মাহমুদা চৌধুরী। 'সাপ্তাহিক বেগম'-এর সঙ্গে তিনি বেশ ক'বছর ধরে জড়িত। ঢাকা ফিল্ম ইন্সটিটিউটের প্রাক্তন ছাত্রী মাহমুদা পরিচালক আলমগীর কবিরের 'সীমানা পেরিয়ে' ছবিতে সহকারী হিসেবেও কাজ করেছেন। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী লেখিকা দিলারা হাশেমেরও পরিচিতি রয়েছে চলচ্চিত্র বিষয়ক লেখালেখিতে। আলোকচিত্রী সাঈদা খানম, সংবাদ পাঠিকা চৌধুরী রীনা নাসের, নাদিরা মজুমদার, ফাল্গুনী হামিদ ও মাঝে মধ্যে চলচ্চিত্র বিষয়ে লিখেছেন। সম্প্রতি চিত্র সাংবাদিকতায় আরেক নতুন নাম সংযোজিত হয়েছে। তিনি সদ্য প্রকাশিত নতুন চিত্র সাপ্তাহিক 'চিত্র বাংলা'র সম্পাদিকা ফুল্লরা বেগম ফ্লোরা

রজনী গন্ধা

'মধুচন্দ্রিমা শেষে এইমাত্র বাড়িতে ফিরেছেন অঞ্জনা। বাড়িতে ফিরেই শ্বাশুড়ির মুখে তার সম্পর্কে শুনলেন কিছু বিরূপ কথা-

আনোয়ারা/'বংশধর'

বার্তা। একেতো নতুন বউ, তার ওপরে ধনীর দুলালী, আধুনিকা। অতএব অঞ্জনার মেজাজ সপ্তমে। খাটের ওপর ব্যাগ, স্যুটকেস রেখে রাগে গর গর করতে করতে তিনি বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। তার স্বামী আলমগীর পোশাক ছেড়ে এসে বসলেন আমাদের সামনে। এফ-ডিসির এক নম্বর ফ্লোরে গত সপ্তাহে স্যুটিং হলো কামাল আহমদ পরিচালিত নতুন ছবি 'রজনী গন্ধা'র। অঞ্জনা-আলমগীর ছাড়াও এ ছবিতে রয়েছেন রাজ্জাক ও শাবানা। বশীরুল হক প্রযোজিত এ ছবির কাহিনীকার হচ্ছেন চিত্র সাংবাদিক জয়নুল আবেদীন। চিত্র গ্রহণে রয়েছেন অরুণ রায়।

সোহাগ মিলন

আমরা যখন এফডিসির দু'নম্বর ফ্লোরে পৌঁছলাম তখন সুভাষদত্তের 'সোহাগ মিলন'-এর একটি ফাইটিং দৃশ্য ক্যামেরায় তোলা হয়ে গেছে। আমরা গিয়ে দেখি শুরু হয়েছে একটি গুহায় নর্তকী জুলেখার নাচ। নর্তকীর অদ্ভুত সাজ-পোশাক। ঢাকায় কোন ছবিতে নর্তকীদের এ ধরনের পোশাক-আশাক দেখেছি বলে মনে পড়লো না। সংক্ষিপ্ত কাপড় চোপড়, খুবই আঁটোসাটো, প্যান্ট হাঁটু পর্যন্ত, হাত, কোমর, পা পর্যন্ত ঝুলে আছে রেশমী ফিতা (?), মাথায় গলায়, হাতের প্রতিটি আঙুলে ঝকমক অলংকার তো আছেই। গানের তালে তালে নাচছিলেন নর্তকী জুলেখা। নৃত্য পরিচালক আলম বললেন—'কাট'। পরিচালক সুভাষ দত্ত বললেন, কাটতে যে ইচ্ছে করছেনা। 'সোহাগ মিলন'-এর এই নর্তকীটির নাম রোজিনা।

চিৎকার

এফডিসির তিন নম্বর ফ্লোরে নতুন পরিচালক মতিন রহমানের 'চিৎকার' ছবির স্যুটিং এখনো অব্যাহত রয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা মোহন প্রায়ই আসে পতিতা মোমেনার ঘরে। তার লক্ষ্য মোমেনা নয়, তার কিশোরী মেয়ে কুসুম। কুসুমকে সে ভালোবাসে। মোহন মোমেনাকে ডাকে খালা বলে। ঘরে ঢুকে কুসুমের খোঁজ করতেই শোনা গেলো খালা মোমেনার বাজখাই গলা। কুসুমের পথ থেকে সরে দাঁড়াবার স্পষ্ট আদেশ। কারণ, মোমেনা কারো কাছ থেকে শুনেছে যে মুক্তিযোদ্ধারা ভালো নয়, লুটপাট হাইজ্যাক করে, মানুষ মারে। মোহন চিন্তিত হয়। সেদিন এই পর্যন্তই ছবির স্যুটিং দেখলাম। ছবিতে মোহন হচ্ছে ফারুক, মোমেনা সুচন্দা আর কুসুম সুচরিতা। ছবির চিত্রগ্রহণে রয়েছেন চিত্রগ্রাহক প্রযোজক রেজা লতিফ। মতিউর রহমান পানু পরিচালককে সহায়তা করছেন নানাভাবে।

রোজিনা

রাজা সাহেব

পয়সাওয়ালা রাজ্জাকের যেমন আছে প্রতাপ তেমন আছে মদ-মেয়ে মানুষের প্রতি আসক্তি। রোজিনাকে তিনি ধরে এনেছেন ঘরে। রোজিনা বাধা দিচ্ছেন প্রবলভাবে, জালিমের বিচার দাবি করছেন আল্লাহর কাছে। কিন্তু ডাবিং-এর সময় 'রাজাসাহেব' রাজ্জাক নেই, (তিনি কোলকাতায়) আছেন কেবল রোজিনা। লম্পট রাজ্জাকের কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে রোজিনা সংলাপ আওড়াচ্ছেন। পরিচালক, খসরু নোমান তাঁকে বোঝাচ্ছেন, তুমি মনে করো তোমার পাশে কেউ ছিলোনা, একমাত্র আল্লাহই তোমাকে রক্ষা করেছেন এই অবস্থায়। পরিচালকের কাছ থেকে জানা গেলো ছবির 'রিলিজ' টার্গেট হচ্ছে আগামী ঈদ।

রেশমা

'আলতাবানু'

অভিনেত্রী শাবানার পিতা ফয়েজ চৌধুরীর পরিচিতি একজন ফোক-ফ্যান্টাসী ছবির নির্মাতা হিসেবে। তাঁর 'মালকাবানু' চট্টগ্রামের লোকগাঁথা অবলম্বনে তৈরি। বছর ছয়েক আগে মুক্তিপ্রাপ্ত এ ছবিটি হিট করেছিলো। এখনো লোকের মুখে মুখে এ ছবির গান শোনা যায়। ফয়েজ চৌধুরী পরে তৈরি করেন 'বিজয়িনী সোনাভান।' এ ছবিটিও ভালো ব্যবসা করেছে। তাঁর তৃতীয় ফ্যান্টাসী ছবি 'আলতা বানু'র বর্তমানে শুটিং চলছে। গত সপ্তাহে এফডিসির দু'নম্বর ফ্লোরে এ ছবির শুটিং হলো। পরী রাজ্যের একটি সেটের কাজ হলো এখানে। অনেক ডানাওয়ালা পরীরা এতে অংশ নিলেন। ছবি

প্রধান পরীরাণী হচেছন শাবানা। আরেকজন হচেছন নূতন। এ সেটেই দেখা ছবির নায়ক ওয়াসীমের সঙ্গে। তিনি 'রিলাক্সিং মুডে' একজন চিত্রসাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলছিলেন। তাঁর শরীরে দেখলাম আঘাতের চিহ্ন। ছবিতে তাঁর ভূমিকা কি জানতে চাইলে তিনি বললেন, প্রেম, মারামারি আবার প্রেম। তবে ছবির একটি আলাদা বৈশিষ্ট রয়েছে। কি রকম ? পরিচালক ফয়েজ চৌধুরীর ছবিতে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক আবহ থাকবে স্বাভাবিকভাবেই। তিনি বললেন। 'আলতাবানু' তৈরি হচেছ আলমগীর পিকচার্সের ব্যানারে।

নূতন কয়েকটি ছবির নায়িকাও'

১ বর্ষ ৪৮ সংখ্যায় এই বিভাগে প্রকাশিত অভিনেত্রী নূতন কে নিয়ে লেখা প্রতিবেদন সম্পর্কে তাঁর স্বামী বাবুল জানিয়েছেন, চিত্রজগতে বর্তমানে নূতনের অবস্থান বেশ ভালোই রয়েছে। তিনি 'রাজনর্তকী' ও 'সিআইডি' ছবিতে নায়িকা হিসেবে কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করছেন। তাঁদের নিজেদের প্রোডাকশনের ছবি চাঁদ সুরুজ' ছবিতেও দুই নায়িকার একজন তিনি।

প্রমোদকর ফাঁকি

সেদিন 'অভিসারে' রাতের প্রদর্শনীতে দু'জন 'বিনি সুতার মালা' দেখতে গিয়ে ডিসির কাউন্টারে টিকেটের জন্য দাঁড়াতেই একজন লোক এসে জানতে চাইলো তারা টিকেট কিনবে কিনা। হাঁ বলতেই লোকটি নিজেকে পরিচয় দিলো প্রেক্ষাগৃহের চাকরিজীবি হিসেবে। তারপর লোকটি তাদের নিয়ে ওপরে চলে গেলো। বললো, টিকেট ছাড়াই আপনারা ছবি দেখতে পারবেন। তবে দামটা আমাকে দিয়ে দেবেন। এরপর লোকটি কর্তব্যরত দারোয়ানের কানে কানে কি বলে গেলো। ছবি শুরু হওয়ার আধ ঘন্টা পর ঐ লোকটি এসে নিয়ে গেলো দুটো ডিসি টিকেটের দাম—২৫ টাকা !

এ ধরনের অবস্থা কি করে চলছে? স্বভাবেই চলুক এতে যে সরকার প্রমোদ কর থেকে বঞ্চিত হচেছন এটা স্পষ্ট। এই প্রমোদ কর ফাঁকি দেয়ার ব্যাপার শুধু রাজধানীতেই সীমিত নয়, মফঃস্বলেও হচেছ। চট্টগ্রাম থেকে দিলীপ ও স্বপ্ন এ ধরনের প্রমোদকর ফাঁকি দেয়ার একটি ঘটনার কথা চিঠি লিখে জানিয়েছেন আমাদের। চিঠির সঙ্গে প্রমোদকর

শাবানা, নূতন/'আলতাবানু'

স্ট্যাম্পহীন দুটো টিকেটও পাঠিয়েছেন তাঁরা। 'আলমাস' প্রেক্ষাগৃহে গত ৯ মে সন্ধ্যাকালীন শো'র সময় রিয়ার স্টলে ছবি দেখার সময় তাঁদের যে টিকেট দেয়া হয় তাতে কোন স্ট্যাম্প ছিলো না।

টুকরো খবর

ক্যামেরার চোখে ভাইরাসঃ চক্ষুরোগ সংক্রমিত হয়েছে চিত্রপুরীতেও। একজন প্রভাবশালী ব্যক্তির চক্ষুপীড়ার কারণে ভেঙে ফেলতে হয়েছে হাজার হাজার টাকায় বানানো 'আকাশপরী'র সেট। সুস্থ চোখে যারা এই সেটটি দেখেছেন তারা আফশোস করেছেন শুধু এদিকে লাভ ইন সিঙ্গাপুর' ছবির শুটিংও একদিন বন্ধ রাখতে হয়েছিলো ববিতার চোখের অসুখের জন্যে। চোখের অসুখে ভুগছেন সুচরিতা, রোজিনা ফারুক, বুলবুল রোজী প্রমুখ তারকাও। তবে চোখের অসুখ নিয়ে কাজ করতে দেখা গেছে জসিমকে।

সম্ভাবনার ৮২ সালঃ পরিচালক আকবর কবীর পিন্টু বললেন 'আর কিছুটা দিন, বিরাশি সাল থেকেই দেখবেন চিত্রজগতে সাফল্য আসছে নতুন ছবির মানে সামাজিক ছবির। গত কয়েক মাসে পোশাকী-ফ্যান্টাসী ছবির যে অবস্থা দেখা গেছে তাতে এই সম্ভবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

কাহিনীকার নকল করলে.........ঃ নকলের অভিযোগে সেন্সরবোর্ড কর্তৃক 'দোস্তী'র সার্টিফিকেট প্রত্যাহার করে নিয়ে যাওয়ার জন্যে বিস্তর ঝামেলা ও আর্থিক ক্ষতি পোহাতে হচেছ প্রযোজক আজমল হুদা মিঠুকে। সেদিন দেখা হতেই বললেন, কাহিনীর নকল করলে আমাদের কি দোষ বলুন। তবে এবার 'দোস্তী'কে নতুন করছি পাঁচটি 'রীল' আবার 'শুট' করে। আশা করি আর কোন ঝামেলা থাকবে না।

রাখে আল্লাহ মারে কেঃ 'অশান্ত ঢেউ'-এর পর 'রাখে আল্লাহ মারে কে' পরিচালনা করেছেন আবদুস সাত্তার। বহু ঝুট ঝামেলায় ছবিটির নির্মাণ কাজ মন্থর গতিতে শেষ হলেও সেন্সর বোর্ডের সার্টিফিকেট পেতে দেরি হয়নি। 'আনকাট' পাস হয়েছে। ছবিটি ৫ জুন মুক্তি পাবে বলে কথা আছে।

কবরী মা হতে যাচেছনঃ কবরী মা হতে যাচেছন এই সংবাদে তাঁর ছবির পরিচালকদের চিন্তাই বেশি। সেদিন শহীদুল হক খানের একজন সহকারীর সংগে দেখা হতেই জিজ্ঞেস করলাম 'কলমীলতা'র খবর কি? কোনমতে কবরীর কাজগুলো শেষ করেছি। বাকি কিছু টুকটাক কাজ আছে সুচরিতা ও অন্যান্যদের নিয়ে। বললেন তিনি। এদিকে নতুন ছবি 'প্রেম বন্ধনে' কবরী কাজ করে যাচেছন নিয়মিত।

অনুপম হায়াৎ

তারেক শফিক 'মিলন'

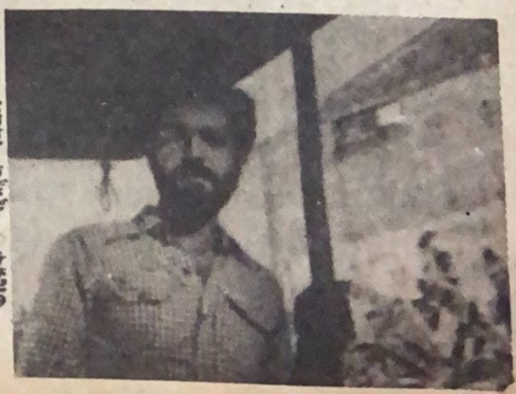

রূপসী বাংলার রূপসী মেয়েদের জন্য —
. সুখবর!

আপনার রূপকে আরও মোহনীয় ও আকর্ষণীয় করে তুলতে জড়োয়া-সেটের জুড়ি নেই। মনের মতো চোখ জুড়ানো আধুনিক ডিজাইনের হালকা ওজনের জড়োয়া-সেটের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান —

ইসলাম জুয়েলার্স
(শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত)
আমিন জুয়েলার্স লিঃ -এর
(শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত)
একটি অন্যতম সহযোগী প্রতিষ্ঠান।
৭৩ ও ৭৭, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা-২
ফোন: ২৫ ৪৫ ৪৫ ২৫ ৪৬ ২৭ ২৩,২৫ ১৪

ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন

ভালবাসা অপরাধ নয় তবে তা ফিরিয়ে দেয়া ঘৃণ্যতম পাপ যা মানুষ প্রায়ই করে থাকে।— জসিম মল্লিক, বরিশাল।

বিত্তবান বণিক নই, বিরাট বৃক্ষ নই, নই কোন দাপটের দেবতা। তবুতো পারি দিতে রক্তের উতলতা, শব্দের সমগ্র উচ্ছ্বাস, হৃদয়ের আনন্দ উত্তাপ— অচেনা বৈভব যা কিছু আছে সব, ...ভীষণ একা। মেয়েরা লিখুন। —পলাশ, ৩য় বর্ষ, সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ ছাত্রাবাস, মিটফোর্ড, ঢাকা-১।

সুন্দর মনের মেয়েদের মধুর লেখনীর মাঝে প্রবাসের একাকীত্ব ভুলতে চাই।—
A. K. M. Younus, P.o. Box-197, AL-Fujairah, U. A. E.

আমি একজন বাঙালী মেয়ে। কয়েক বছর ধরে বিলেত আছি। বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংবাদ জানতে আমি খুব ইচ্ছুক। যে কেউ লিখতে পারেন। উত্তরের নিশ্চয়তা রইলো।—
Farida, 50, High street, Stony Stratford, Milton Keynes, M. K. 11--I A Q, U. K.

ইদানীং যারা নিজেদের চোখে সুন্দরী হয়ে উঠেছেন তাদেরকে চিঠিতে আমন্ত্রণ।—
Asif Ashraf, P.o. Box No-6199, Sharjah, U. A.

আসুন মিতালীর মাধ্যমে পরিচিত হই। ভাই, বোন, বন্ধু, বান্ধবীরা নিঃসংকোচে লিখুন। উত্তর সুনিশ্চিত।—
Zafar Ahmed, Post Box No-2982, Doha, Qatar.

রুচিশীল বন্ধু-বান্ধবীরা লিখুন।—
Md. Ana Miah (Unus), P.o. Box No-1922, Camp No-1, Block No-B--20, Room No-3, Jeddah, Saudi Arabia.

কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা ও ভাবীরা লিখুন।— আকতার হোসেন, ৩৩৫, মহসিন হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা অথবা ৫২, যোগী নগর, ওয়ারী, ঢাকা, ফোন-২৮১০৯৪।

লিখুত
স্বর্ণ অলংকারের এক নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
মুক্তা জুয়েলার্স
৬৮, বায়তুল মোকাররম (দোতলা)
ঢাকা • ফোন • ২৩২৩২০

এখানে মহিলাদের আধুনিক পোষাক প্রস্তুত ও রেডিমেড ব্লাউজ, শাড়ীর ফলস, ফ্রক পেটিকোট বিক্রয় করা হয়।

বিঃদ্রঃ মাত্র তিনদিনে ডেলিভারী দেওয়া হয়।

সুকেশা মাষ্টার টেইলার্স
৩৫৭-৩৫৮, গভঃ নিউ মার্কেট, ঢাকা-৫

জীবন এখন যেমন

পকেট-আইন

সমস্যা—প্রায় পাঁচ মাস আগে আমার ছোট ভাইকে বিদেশ পাঠানোর জন্য আমাদের পরিচিত এক লোকের সঙ্গে আলাপ করি। তিনি নাকি প্রায়ই বিদেশে লোক পাঠান। এবার কথা হলো—তিনি আমার ছোট ভাইকে বিদেশে পাঠাবেন। ওকে দিতে হবে মোট ৪৫,০০০ টাকা। এই টাকার বিনিময়ে ছোট ভাইকে তিনি কুয়েতে পাঠাবেন। যথাসময় আমরা উক্ত লোকটিকে ২৫,০০০ ও পরে তাঁরই উপস্থিতিতে চাটগাঁয় এক ভদ্রলোককে বাকি ২০,০০০ টাকা দিই।

এরপর কিছুদিনের মধ্যেই ছোট ভাই কুয়েত চলে গেলো। কিন্তু সেখানে সে পুলিশের হাতে বন্দী হলো কারণ তাকে নেয়ার জন্য কোম্পানীর কেউ বিমানবন্দরে আসেনি। পরে যোগাযোগ করে জানা গেল কোম্পানী এই নামে কোন এন ও সি প্রদান করেনি। যা হবার তাই হলো। ছোট ভাইটির তিন মাস জেল হয়ে গেলো। এরপর সে যখন ছাড়া পেলো তখন আর এক আত্মীয়ের কাছ থেকে আরও ৯,০০০ টাকা ধার নিয়ে বাড়ি ফেরত আসল। নিশ্চয়ই এবার বুঝতে পারছেন যে আমরা সবাই এখন সর্বস্বান্ত।

যে লোক তাকে পাঠিয়েছিল তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলল যে 'আমি কি জানি? আর আমাকে টাকা দেয়া হয়েছে মাত্র ২৫,০০০, এখন বলুন কি করা যায়। কিসের সাহায্য নিলে আমরা আমাদের টাকা পেতে পারি।

জেসমিন রহমান
ফেনী, নোয়াখালী

পরামর্শ—আপনি প্রতারিত হয়েছেন। উক্ত প্রতারক আপনাকে প্রতারণা করে এতগুলো টাকা নিয়েছে। যার ফলে আপনারা সর্বস্বান্ত হয়েছেন। বাংলাদেশ দন্ডবিধি অনুযায়ী প্রতারণা একটি গুরুতর অপরাধ। উক্ত দন্ডবিধির ৪২০ ধারা অনুযায়ী ফৌজদারী আদালত দোষী ব্যক্তিকে সাত বছর পর্যন্ত কারাদন্ড ও জরিমানার হুকুম দিতে পারেন। আপনি আপনার থানায় এজাহার দিয়ে ফৌজদারী মামলা আরম্ভ করতে পারেন। অথবা এসডিও কোর্টে মামলাটি দায়ের করতে পারেন। ফৌজদারী আদালত কর্তৃক উক্ত ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হলে আপনি দেওয়ানী আদালতে আপনার টাকা আদায়ের জন্য মামলা দায়ের করতে পারেন।

আপনি যদি ফৌজদারী মামলা এড়াতে চান তবে দেওয়ানী আদালতে টাকা আদায়ের জন্য এখনই দেওয়ানী মামলা দায়ের করতে পারেন।

আপনার মামলার ফলাফল সন্তোষজনক সাক্ষী প্রমাণাদির উপর নির্ভর করবে।

বাংলাদেশ মানবাধিকার
বাস্তবায়ন সংস্থা
৯৭, পুরানা পল্টন লাইন
ঢাকা

স্বাস্থ্য ক্যাপসুল

চোখ ওঠা

আজকাল যে 'চোখ ওঠা' রোগ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে তা যে সংক্রামক ইতিমধ্যেই চক্ষু বিশেষজ্ঞরা সে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

তবে অত্যন্ত সহজ কতকগুলো উপায় এবং সতর্কতা অবলম্বন করলে এই রোগটি থেকে রেহাই পাওয়া যায় এবং আক্রান্ত হলেও সহজে আরোগ্য লাভ সম্ভব।

এ রোগটি সংক্রামক হলেও বাতাসে সংক্রমিত না হয়ে সরাসরি সংক্রমিত হয়। যেমন কেউ যদি চোখ ওঠা রোগীর সঙ্গে হাত মেলান বা তার চোখে হাত দিয়ে সে হাত নিজের চোখে লাগান তবে এ রোগ সহজেই সংক্রমিত হবে।

চক্ষু বিশেষজ্ঞদের মতে—বর্তমানে প্রত্যেকেরই চোখে হাত দেয়ার আগে ভালভাবে সাবান দিয়ে তা ধোয়া উচিত। এমনকি চোখ যদি চুলকায়ও তবে উচিত হবে চোখে হাত না দেয়া এবং প্রয়োজনবোধে হাত ভালভাবে সাবান পানি অথবা জীবাণুনাশক ওষুধ মিশ্রিত পানির সাহায্যে হাত ধুয়ে তারপর চোখে হাত দেয়া।

চক্ষু বিশেষজ্ঞরা কিছু কিছু সতর্কতাও অবলম্বন করতে বলেছেন। যেমন—

ইদানীং যে চোখ ওঠা রোগ দেখা দিয়েছে তা ভিন্নতর এবং তাতে রোগীর চোখের মধ্যে বিন্দু বিন্দু ঘা-এর সৃষ্টি হয় ঠিক এ অবস্থায় 'কর্টিসন' বা 'স্টেরয়েড' জাতীয় উপাদান রয়েছে এমন ওষুধ বা আইওয়েনমেন্ট ব্যবহার করা উচিত নয়। এবং কোন ক্ষেত্রেই গোলাপ জল, শামুকের পানি, হলুদের রস, গাছের রস বা অন্য কোন 'তেলেসমাতি' ওষুধ দেয়া বা ব্যবহার করা উচিত নয়।

কারন এসব পানিতে ফাংগাস জাতীয় এক ধরনের জীবাণু রয়েছে যা ঐ চোখের ঘা আরও বাড়িয়ে দেয়।

চোখ ওঠা রোগীদের রোদের আলোতে কালো চশমা ব্যবহার করা ভাল। চক্ষু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী আইলোশন বা আইওয়েনমেন্ট ব্যবহার করে গরম পানিতে বরিক সেক দিলে খুব অল্প কিছুদিনের মধ্যেই চোখ সারিয়ে তোলা সম্ভব।

ভুল চিকিৎসা না হলে এ রোগ অত্যন্ত সহজ ও অল্প সময়েই সেরে যেতে পারে।

ডাঃ অরূপ রতন চৌধুরী

কুরুক্ষেত্র

'জীবনে বিয়ে করবো না' এমন বাসনা আমার ছেলেবেলা থেকেই। আমার কাছে বিয়ে মানেই পরাধীনতা, অন্য একজন মানুষের হাতের পুতুল হওয়া। তার অন্যায়কে নীরবে মেনে নেয়া। স্ত্রী মানেই একজন পুরুষের দাসী হওয়া। আমি জানি স্বামী কখনোই স্ত্রীকে সমান অধিকার দেয় না অন্ততঃ আমাদের দেশে তো নয়ই।

আমার ইচ্ছে ছিল ডাক্তার হবো। মানুষের সেবা করবো। বড় হয়ে মেয়েদের প্রতি পুরুষের অত্যাচারের প্রতিবাদ করবো। তাই ম্যাট্রিকে ভাল রেজাল্ট করলাম, ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষাতেও ভাল রেজাল্ট করবো এমন ধারণা আমার ছিল। কিন্তু পরীক্ষার পরই বাবা বিয়ে দেবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলেন। এই নিয়ে সংসারে উঠলো বিরাট ঝড়। অনেক কান্নাকাটি করেও কোন ফল হলো না। বাবা আমার সঙ্গে এমনই অভিমান শুরু করে দিলেন যে আমায় হার মানতেই হলো।

বিয়ে হয়ে গেল। বুঝলাম আমার বড় হবার সব রাস্তা বন্ধ হয়ে গেল। আমিও মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম আমিও স্বামীর কোন অন্যায় সহ্য করবো না। তাতে আমার কপালে যা হবার হবে। শ্বাশুড়ীর সঙ্গে প্রথম আলাপেই বুঝে নিয়েছিলাম তারা আমায় আর পড়াবেন না: শুনে আমি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলাম। বাইরে যাবার সময়ে কখনোই কারো অনুমতি নিতাম না। সংসারের কোন কাজে শ্বাশুড়ীকে কখনো সাহায্য করতাম না। শ্বাশুড়ীকে সবসময়ে এড়িয়ে চলতাম। শ্বাশুড়ী দুঃখ পেতেন তা বুঝেও না বোঝার ভান করতাম। স্বামী যদি একটা শাড়ি আনতেন সঙ্গে সঙ্গে বলতাম আমার পছন্দ হয়নি। বেড়াতে নিয়ে যেতে চাইলে বলতাম, আমার ভাল লাগে না। অথচ প্রতিদিন বিকেল বেলা একা একা বাইরে যেতাম। স্বামী কখনো কখনো ওর বোনদের নিয়ে যেতে বলতেন। জবাবে এমন উল্টো কথা

বলতাম যে ও আমার মুখের দিকে হাঁ হয়ে তাকিয়ে থাকতো। অথচ কোন প্রতিবাদ করতো না। ওর একটা ছোট বোন সবসময়ে আমার সংগে থাকতে চাইতো। কিন্তু আমি বিরক্ত হতাম। একদিন স্বামীকে গিয়ে বললাম, 'আমার পেছনে ভাল গোয়েন্দাই লাগিয়েছো।' আর একদিন ওদের দেশের বাড়ি থেকে ওর কাকা সম্পর্কীয় কয়েকজন লোক এলে যখন শাশুড়ী বললেন, 'যাও মা ওরা তোমায় দেখবেন। ওদের খাবারটাও তুমিই দিয়ে এসো নইলে খারাপ দেখাবে।' তখন হঠাৎ মাথায় রক্ত চড়ে গেল। ব্যংগ করে বললাম, 'ঘরে একটা বাঁদী এনেছেন বাইরের লোককে তা না দেখালে হয় না মা?'

এমনি করে সংসারের সব সুখ শান্তি নষ্ট হলো। ক্রমে টের পেলাম সবাই আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। নিজের জীবনে কোন সুখ ছিল না। ঘরেরও সবার জীবন বিষময় করে তুললাম। এমন মুহূর্তে পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুলো। তখন শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর অমতেই আমাকে সে ভর্তি করালো। একদিন ওর এক বড় বোন এলো সে সময় আমাকে নিয়ে ওদের আলোচনা শুনলাম। ওর বোন ওকে তীব্র ভৎর্সনা করছে 'বউকে প্রশ্রয় দিয়ে মাথায় তুলেছিস, তোর চোখ অন্ধ হয়ে গেছে! মামীর সংগে ও যা তা ব্যবহার করে। আমি হলে অমন বৌয়ের ঠ্যাং ভেঙে ঘরে রেখে দিতাম। আমরা আর স্বামীর ঘর করছি না।'

শুনে আমার স্বামী বললেন, 'দ্যাখো বুবু, আমি বিয়ে করে বউ ঘরে এনেছি বাঁদী ঘরে আনিনি। ওর অনেক বড হবার ইচ্ছে ছিল। হতে পারেনি। ও ডাক্তারী পড়তে চেয়েছিল কিন্তু আমি জানতাম বাবা রাজী হবেন না ওকে হোস্টেলে রেখে পড়াতে। আমি অপেক্ষা করছি ওর মনের স্বপ্ন ভেঙে যাবার দুঃখ ওর মন থেকে যেদিন মুছে যাবে সেদিনের। জানি আমাদের কাছে ফিরে আসবে।' ওর কথা শুনে আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম। ও আমাকে এত গভীরভাবে উপলব্ধি করে। বুবু চলে যাবার পর ওর কাছে গিয়ে কেঁদে ফেললাম। আমার সব কথা ওকে খুলে বললাম, সব শুনে ও বললো, 'স্বামী মানেই অত্যাচারী নয় নিভা।'

স্বপ্ন ভেঙে যাবার দুঃখ আর আমার মনে নেই। আছে নতুন করে জীবন গড়ার স্বপ্ন। এখন আমি একাই সুখী নই! আমার সংসারের সবাই সুখী। আমার ছোট্ট ননদটা সারাক্ষণ আমায় দুষ্টুমিষ্টি আবদারে ভরিয়ে রাখে। শ্বাশুড়ীর কাছে আমি ঘরের লক্ষ্মী। আজ আমার মত সুখী মেয়ে পৃথিবীতে ক'টাইবা আছে!

শামীম আরা (নিভা)
সরকারী শিশু সদন,
মাদারীপুর, ফরিদপুর

খাদ্যবিলাস

কালোজাম

উপকরণ—বড় চা কাপের এক কাপ গুড়ো দুধ, দেড় কাপ ময়দা, এক কাপ ঘি, দু-কাপ চিনি ও এক চায়ের চামচ খাবার সোডা ও ভাজার জন্য সয়াবিন।

প্রণালী—গুড়ো দুধ, ময়দা, ঘি ও সোডা এক সংগে মাখুন। বেশি সময় মাখবার প্রয়োজন নেই। মাখার সময় হাতে সামান্য পানি নিয়ে নেবেন। ময়ানটা একটু ঝরঝরে হবে। ঠিক ময়দার ময়ানের মত হবে না! এবার পরিমাণ মত ময়ান হাতে নিয়ে মুঠোর মধ্যে চাপ দেবেন। তারপর ওটাকে কালোজামের আকার করে প্লেটে সাজিয়ে রাখবেন। সয়াবিন উত্তপ্ত করে কড়াই নামিয়ে কালোজাম কড়াই-এ ছেড়ে দিন। আবার কড়াই উনুনে দিন ও উল্টিয়ে দিন। কালোজাম খয়েরী রং করে নামাবেন। এর আগেই চিনির সিরা করে সসপ্যানে ঢাকনা দিয়ে রাখবেন। এবার ঐ ভাজা কালোজাম সিরায় ভিজিয়ে রাখুন। ঠান্ডা হলে কালোজাম দ্বিগুণ ফুলে উঠবে।

সুফিয়া আমীন দুলু
নোয়াখালি।

বাঙ্গির জ্যাম

উপকরণ—১টা বাঙ্গি, ৪টা কমলা, ৪টা কাগজী লেবু ও চিনি (বাঙ্গির ওজনের সমান)।

প্রণালী—প্রথমে বাঙ্গি কুচি কুচি করে কেটে কাঁচের পাত্রে বাঙ্গির ওজনের সমান চিনি দিয়ে একরাত ফ্রিজে রাখতে হবে। সকালে হাঁড়ি গরম হলে বাঙ্গি দিয়ে অল্প আঁচে রান্না করতে হবে। চিনির সিরা আঁঠা আঁঠা হলে কমলার কোয়া ছাড়ুন ও লেবুর রস দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে নামান। জ্যাম ঠান্ডা হলে বোয়ামে ভরে রাখতে হবে।

সুলতানা হক
গুলশান, ঢাকা-১২

আপন দর্পন

আপনার জীবনকে কে পরিচালিত করে? আপনার অভিভাবক, আপনার গ্রহ কিংবা পারিপার্শ্বিক অবস্থা? ভাগ্য? না আপনি নিজেই? আপনি কি আপনাকে ও আপনাকেই আপনার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে সুনিশ্চিত বোধ করেন? অথবা আপনি কি অদৃষ্টবাদী?

আজকের আপন দর্পণে অংশ নিয়ে দেখুন, আপনি কতটুকু ভাগ্য দ্বারা এবং কতটুকু নিজের দ্বারা পরিচালিত হোন।

১। আপনি কি গ্রহের ফের মেনে চলেন? কুসংস্কারের বিশ্বাস করেন? কিম্বা অশুভ ১৩ সম্পর্কে শঙ্কিতবোধ করেন?

(ক) এগুলোর কোনও একটাও না।

(খ) এর একটি

(গ) দুইটি

(ঘ) দুয়ের বেশি

২। ধর্ম সম্পর্কে আপনার মনোভাব কি?

(ক) ... গত যানই না।

(খ) বিরক্ত প্রকাশক: 'ধর্ম আপনার কাছে আফিম মাত্র'

(গ) মুক্ত: দুর্ভাগ্য এবং একাকীত্বে এটা একটা সান্ত্বনা, কিন্তু আপনার কাছে একেবারেই অপ্রয়োজনীয়।

(ঘ) দার্শনিক: ধর্ম আসবে একেবারে শেষে, যখন মৃত্যু একটা ছোট্ট বিরতি হিসেবে দাঁড়াবে এসে।

৩। আপনি যদি কখনো কোন দুর্ঘটনায় পড়েন যেমন ট্রেন দুর্ঘটনা, ভূমিকম্প, লণ্ডভণ্ড ইত্যাদি তখন। সাধারণত আপনি—

(ক) দুশ্চিন্তা মুক্ত থাকেন।

(খ) মরিয়া হয়ে অন্যের সাহায্য প্রার্থী হন।

(গ) উদ্ধার পাওয়ার জন্য চেষ্টা করেন।

(ঘ) চোখ বন্ধ করে ফেলেন এবং মনে মনে আশা করেন যে কয়েক মিনিট পরেই হয়তো সব ঠিকঠাক হয়ে উঠবে।

৪। ছেলেবেলার কোন ভাল গল্পের নায়িকা আপনার কল্পনায় এখনো আচ্ছন্ন হয়ে আছে:

(ক) সোনার কাঠি রুপোর কাঠির রাজকন্যে, যে রাজকুমারের স্পর্শে জেগে উঠবে

(খ) সিনড্রেলা—যে শুধুমাত্র পরী রাণীর যাদুবলে নিজেকে বিকশিত করেছিল

(গ) আলেফ লায়লার—হাজার একরাতের কাহিনীর

(ঘ) মৎস কন্যা—যে নির্বাক হয়েও তার প্রিয়ের জন্য অনেক যাতনায় ভুগেছে

৫। জীবনের উন্নতির জন্য কি সবচাইতে বেশি সাহায্য করে?

(ক) বুদ্ধিমত্তাকে উন্নত করার জন্য প্রচুর কষ্ট করা।

(খ) ভাল অভিভাবক ও প্রভাব-শালী লোক থাকা।

(গ) স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য অথবা বুদ্ধিমত্তা যা নিয়ে একজন মানুষ জন্ম নেয়।

(ঘ) কোন কিছু অর্জনের জন্য প্রভাব থাকা, সুযোগ পাওয়ার মত দূরদৃষ্টি থাকা এবং অবিচল থাকা।

৬। আপনি যা আশা করেন

—তার চাইতে বড় কৃতকার্য হোন। এরজন্য দায়ী কি—

(ক) সহযোগী প্রতিযোগীর চতুরতা, অভিজ্ঞতার ওপর ছেড়ে দেওয়া—

(খ) ভাবেন যে, আপনার পরিচর্যার অভাব বলেই

(গ) আপনার ছোট পা, ছোট চোখ কিংবা স্বাস্থ্যের প্রতি দোষারোপ করেন।

(ঘ) অথবা অন্য কোনও খেলাধূলায় মেতে উঠেছেন। যেখানে প্রতিযোগীকে অসুবিধায় নিক্ষেপ করা যাচ্ছে।।

৭। আপনার কোন মেয়ে বন্ধু তার স্বামীর ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে এবং সে ডিভোর্স আশা করছে তখন আপনি ঃ

(ক) বলবেন যে সবসময়ই আমি তোমার দুঃখ দুর্দশার ছিলাম অতএব তুমি অন্যকারও কাছে গেলে ভাল থাকবে।

(খ) তাকে ডিভোর্সের ভাবনা থেকে দূরে যেতে সাহায্য করবেন এবং কলুষিত একাকীত্বকে সঙ্গ দেবেন।

(গ) তাকে বলবেন যে সম্ভবতঃ তার স্বামী তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ নয়—তাই তাকে তার স্বামীর ভালবাসা ফিরে পাওয়ার জন্য হৃদয় দিয়ে— আন্তরিকতা দিয়ে কাজ করা উচিত।

(ঘ) অন্যায় আচরণ করা নয়। তাকে আপনার কাছে কাঁদার জন্য সান্ত্বনা ও সাহস দেবেন।

৮। আপনি কোন নতুন সিনেমার নায়ক/ নায়িকাকে আপনার স্কুলের বন্ধু বলে চিনতে পারলেন। এখন আপনার প্রতিক্রিয়া হবে।

(ক) বাজী ধরা যে আরাম শয্যার মতো অভিনয়ের জন্য কাজ করেছে।

(খ) কখনো ভাবেননি যে সে অভিনয়ের মতো পেশা বেছে নেবে।

(গ) আপনি আশ্চর্য হয়েছেন যে সে কিভাবে ঠিক লোকটির সন্ধান পেল।

(ঘ) 'ভাগ্যবান দুঃখহীন' ভাবেন।

৯। বড় বড় সরকারী চাকরিতে মেয়েদের সংখ্যা কম। কারণ

(ক) মহিলারা উচু পদের জন্য উচ্চাভিলাষী নয়।

(খ) এ সমাজে দক্ষতা সম্পন্ন মহিলার যথেষ্ট অভাব আছে।

(গ) নির্বাচকমণ্ডলীর মহিলাদের ওপর ততোটা আস্থা নেই যতোটা পুরুষদের প্রতি আছে।

(ঘ) মহিলারা তাদের গতানুগতিক কর্মকাণ্ডে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট সেটা হচ্ছে—'একজন মহানব্যক্তির (স্বামী) পেছনে তারা একটা শক্তি।'

ফলাফল ঃ

৯—১১ ঃ আপনি একজন রহস্যময় মানুষ। আপনি বিশ্বাস করেন যে আপনার জীবন— পারিপার্শ্বিক প্রভাব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আপনি ভাগ্য সমুদ্র পার্শ্বে বালুকণার মত অর্থাৎ পরিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা পরিচালিত হন। আপনি ভাগ্য, সুযোগ ইত্যাদির অপেক্ষায় থাকেন। আপনি রাশিচক্র ভাগ্যগননা, গ্রহ ইত্যাদির নিয়মিত পাঠক এবং অলৌকিক ও আধ্যাত্মিক ঘটনার প্রতি আপনার বিশ্বাস আছে। আপনি খেলাধূলায় আগ্রহী কিন্তু বিজ্ঞানের সোজাসুজি বক্তব্যে আপনি সন্দেহ প্রবন। দুর্দশাগ্রস্থ অবস্থায় আপনার অদৃষ্টবাদ ধারণা আপনাকে প্রফুল্ল ও অবিচলিত রাখে। জীবনকে আপনি সহজভাবেই গ্রহণ করেছেন—বলতে গেলে অদৃষ্টের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন।

১২—২৩ ঃ অল্প হলেও আপনি আপনার আয়ত্তাধীন কিন্তু প্রভাবের শিকার। কিন্তু আপনার কাছে ওগুলো অপরিহার্যভাবে মানবিক। আপনি আপনার সম্বন্ধে কিছুটা আস্থাবান কিন্তু ঐ প্রভাব থেকে মুক্ত থাকার ক্ষমতা আপনার কম। আপনার সহজাত প্রবৃত্তি অনেকটা মেয়েলী। অর্থাৎ আপনি আপনাকে অন্যের কৌশলের শিকার হিসেবে দেখতে চান। কোন কোন সময় আপনি সঠিক কিন্তু আরও বেশি আস্থা নিয়ে তাকান—দেখবেন অন্যেরা আপনার ভাবনার চাইতে অনেক বেশি দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ও আক্রমনাত্মক।

২৪—৩৫ ঃ আপনার অর্থ ও বিলাসের প্রতি বিশ্বেস আছে ? অভিজ্ঞতা থেকে আপনি জানেন কোন জিনিস অর্জন করতে হলে— কোন কোন জিনিস মেনে নিতে হতে থাকে।—গ্রহ সম্পর্কে আপনার তেমন কোন আগ্রহ নেই। কিন্তু আশাভঙ্গ, ব্যর্থতা ইত্যাদি আপনাকে আপনার পছন্দসই বাস্তববাদের অনুগামী করে।

৩৬ এবং এর উপরে ঃ আপনি একজন সাহসী লোক। সমস্ত-শক্তি এবং দৃঢ় অভিলাষ আপনার মধ্যে বিদ্যমান। এইরকম দৃঢ়তা এবং দক্ষতা আপনাকে জয়ী হতে সাহায্য করে। আপনি আপনার পরাজয়কে কি ভাবে গ্রহণ করেন, একটা শিক্ষা হিসেবে।—যা আপনাকে পরবর্তিতে জয়ী হতে সাহায্য করে এধরনের অধিক সংগ্রাম ও পরিশ্রম—হয়তো আপনাকে বলশালী করতে পারে, অথবা সাংঘাতিক করে তুলতে পারে। অন্যান্য লোক যেভাবে অদৃষ্ট, ভাগ্য ইত্যাদির উপর বিশ্বাস করে যে মানবিক শান্ত্বনা লাভ করে আপনি কিন্তু ওগুলোর ওপর আস্থা না রেখেও আপনার দৃঢ়তার দ্বারা সফলকাম হওয়ার আশা রাখেন। এটা হচ্ছে আপনার অসাধারণ কর্ম ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ। সবকিছুর জন্য পুরোপুরিভাবে আপনাকে দায়িত্ববান হবার দরুন, মাঝে মাঝে এর মাশুলও দিতে হতে পারে।

১।	ক	৪ ;	খ	৩ ;	গ	২ ;	ঘ	১
২।	ক	১ ;	খ	২ ;	গ	৪ ;	গ	৩
৩।	ক	৩ ;	খ	২ ;	গ	৪ ;	ঘ	১
৪।	ক	১ ;	খ	২ ;	গ	৪ ;	ঘ	৩
৫।	ক	৪ ;	খ	২ ;	গ	১ ;	ঘ	৩
৬।	ক	২ ;	খ	৪ ;	গ	১ ;	গ	৩
৭।	ক	২ ;	খ	৩ ;	গ	৪ ;	ঘ	১
৮।	ক	৩ ;	খ	৪ ;	গ	২ ;	গ	১
৯।	ক	১ ;	খ	৪ ;	গ	২ ;	ঘ	৩

সংগ্রহ—হোসনে আরা কবীর

ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন

শীঘ্রই বেরুচ্ছে সাহিত্য সংকলন "অপরাজিতা।" ছোট গল্প, কবিতা, কৌতুক লেখা আহ্বান করছি। আগ্রহীরা এক টাকার অব্যবহৃত ডাকটিকেটসহ লিখুন।— সম্পাদক, "অপরাজিতা", ওহিদুল হক, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া।

পশ্চিম বাংলার মুক্তমনা মেয়েরা লিখুন। বিনিময়ে ভিউ-কার্ড পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।—
Amirul Mumin, Heister Camp-7, 4620, Castrop—Rauxel, West Germany.

পশ্চিম বাংলা বিশেষ করে কলকাতার মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে আমি ভীষণ আগ্রহী। বই পড়া এবং চিঠি লেখা আমার সখ। বাংলা/ইংরেজী উভয় পত্রই গ্রহণযোগ্য।—
Omar khaled, Hasel weg-23, 4620, Castrop—Rauxel, West Germany.

প্রেম নয়—বন্ধুত্ব চাই। বাংলাদেশী মেয়েরা লিখুন।—
Mamun, P.o. Box-5868, Sharjah, U. A. E.

এই মহান রাষ্ট্রনায়কের মৃত্যুতে আমরা শোকাহত।
তাঁর কর্মময় জীবনের শিক্ষা আলোকবর্তিকা
হিসেবে প্রোজ্জল থাকুক আমাদের যাত্রাপথে।

নিউ আলাউদ্দিন সুইটমিট

গ্রীন সুপার মার্কেট-ঢাকা